অন্যায় খেলা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬২

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রণে :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামানিক রোড
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

তপতী ও মৃণাল বসুচৌধুরীকে—

॥ ১ ॥

কমলজ্যোতির সঙ্গে আমার যখন ভালো পরিচয় ছিল না, তখন ওর সম্পর্কে আমি নানান রকম গল্প শুনতাম। কমলজ্যোতি প্রদীপের বন্ধু। প্রদীপকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি, আগে কখনো ওর মুখে কমলজ্যোতির নাম শুনিনি। আমি মাস দুয়েকের জন্য দিল্লী গিয়েছিলাম, ফিরে আসার পর প্রদীপের মুখে অনবরত কমলজ্যোতির গল্প শুনছি। খুব ছেলেবেলা দার্জিলিং-এ প্রদীপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল কমলজ্যোতির, তারপর বহুদিন দেখা হয়নি। হঠাৎ একদিন পার্ক স্ট্রীটে দেখা।

প্রদীপ আমাকে বলল, চল্ তোকে একদিন কমলজ্যোতির বাড়িতে নিয়ে যাব।

আমি সাধারণত অচেনা মানুষজনের সঙ্গে আলাপ করতে বেশি উৎসাহ বোধ করি না। তিরিশ বছর বয়স পেরিয়ে গেলে আর সহজে নতুন বন্ধুত্ব হতে চায় না। এই সময় থেকে বাল্যবন্ধুরা একে একে হারিয়ে যায়, নতুন পরিচিতদের সঙ্গেও ভদ্রতার আবরণ ছিঁড়ে হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছানো যায় না। যেমন, রবীনের সঙ্গে আমি ইস্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। কিন্তু রবীন আমাদের মধ্যে সবচাইতে আগে বিয়ে করে ফেললো, এবং বিয়ের পরই আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে দূরত্ব বাড়তে লাগলো। রবীনের স্ত্রী বেশ ভালো মেয়ে, কখনও ওদের বাড়িতে গেলে খুব যত্ন-টত্ন করে—কিন্তু আমি আর রবীন সেই আগেকার মতন প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে আর পারি না।

এখন আর রবীনের সঙ্গে দেখা হয় খুব কম। যখন দেখা হয়, আমরা দু'জনেই বুঝতে পারি, আমরা আর আগেকার মতন বন্ধু নেই। মুখে কেউ কিছু প্রকাশ করি না, ভেতরে ভেতরে দুঃখ থেকে যায়।

এই রকম ভাবেই আস্তে আস্তে পুরানো বন্ধুরা দূরে সরে যাচ্ছে, নতুন বন্ধুও হয় না। নতুন কোন বন্ধু পাবার জন্য আমি উৎসাহ বোধ করি না।

আমি প্রদীপকে বললাম, আমি ওর বাড়িতে গিয়ে কি করবো!

—চল্ না বেশ ভালো লাগবে। ও একটা অদ্ভুত ছেলে।

—আমি ঢের অদ্ভুত ছেলে দেখেছি। আর দেখার ইচ্ছে নেই।

—তুই কমলজ্যোতির মত ছেলে দেখিস নি। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি।

—প্রদীপ,তুই যে এই ক'দিনেই কমলজ্যোতির খুব ভক্ত হয়ে গেছিস দেখছি!

—ভক্ত কেন হবো? ছেলেটা খুব ইণ্টারেস্টিং!

—কোথায় থাকে?

—লিটল রাসেল স্ট্রীটে।

—সে তো সাহেব পাড়া আর অফিস পাড়া! সেখানে থাকে? তোর বন্ধু কি বাঙালী? খুব বড়লোক বুঝি?

—খাঁটি বাঙালী। কমলজ্যোতি চ্যাটার্জি। তুই ডি. এন. চ্যাটার্জির নাম শুনিস নি?

—না, কে সে? মানে কে তিনি?

—এককালে মস্তবড় একজন ফিলম্ প্রোডিউসার ছিলেন। কলকাতায় ওঁর নিজস্ব স্টুডিও ছিল, বম্বেতেও কয়েকখানা ছবি তুলেছেন—

—তা তুলতে পারেন। আমি নাম শুনি নি।

—কমলজ্যোতি হচ্ছে সেই ডি. এন. চ্যাটার্জির ছেলে। ওর মা-ও এককালে খুব নামকরা গায়িকা ছিলেন। ওর মা'র নাম হচ্ছে—

—সবাইতো বলছিস এককালে ছিল। তোর বন্ধুর বয়স কত?

—আমাদের বয়েসী হবে। ও হচ্ছে বাবা-মায়ের সবচাইতে ছোট ছেলে—ওর ওপরে পাঁচ বোন। বোনেরা অবশ্য অবাঙালী বিয়ে করেছে, একজনের বিয়ে হয়েছে গোয়েঙ্কা ফ্যামিলিতে।

—এ তো খুব বড় ব্যাপার। এসব জায়গায় ভাই আমার পোষাবে না। লিটল রাসেল স্ট্রিটে বাড়ি—নিশ্চই বাড়ীতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে?

—আরে না, না। সেসব কিছু না। লিটল রাসেল স্ট্রীটে ও শুধু একটা ঘর নিয়ে একলা থাকে। ব্যাচেলার। ভালো আড্ডা মারার জায়গা। ছেলেটাও খুব জমাটি।

—এতদিন তোর মুখে কমলজ্যোতির নাম শুনি নি কেন?

'—আমি যখন দার্জিলিং-এ সেণ্ট পল্‌সে পড়তাম, তখন ওর সঙ্গে চেনা ছিল। তারপর ও হঠাৎ বিলেত চলে গেল পড়াশুনা করতে। তারপর আর দেখা নেই। বহুকাল আগেকার কথা। পার্ক স্ট্রীটে হঠাৎ একদিন দেখা—কেউ কাউকে ঠিক চিনতে পারি নি। কথায় কথায় সব বেরিয়ে পড়লো।

—তোর বন্ধু বিলেতফেরত? এখানে কোথায় চাকরি করে?

—চাকরি করে না।

—বিলেতফেরত, অথচ চাকরি করে না? বাবার ব্যবসা দেখছে?

—ওর বাবা মারা গেছেন। ফিলমের ব্যবসা ডকে উঠে গেছে। বিলেতে ওদের একটা বাড়ি আছে—সেই বাড়ির ভাড়া পায় অনেক টাকা। বছরে ও ছ'মাস বিলেতে থাকে, ছ'মাস থাকে কলকাতায়।

—বিলেতে যে ছ'মাস থাকে, সে বাকি ছ'মাস কলকাতায় পচে মরতে আসে কেন? কী আছে কলকাতায়?

—আড্ডা মারার লোভে কলকাতায় আসে।

—বিলেতে বুঝি আড্ডা হয় না?

প্রদীপের স্বভাব জানি আমি। কখনো কারুর সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলে ওর কল্পনার আর 'সীমা থাকে না। কত ব্যাপার যে বানাচ্ছে এর মধ্যে। প্রদীপ একবার আসাম থেকে ঘুরে এসে আমাদের বললো, ও বুনো হাতী শিকার করে এসেছে একটা শিকারী দলের সঙ্গে। এমন পঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল শিকারের, যে, অবিশ্বাস

ফেরাও যায় না সহজে। পরে জানা গিয়েছিল, প্রদীপ আসামে গিয়ে যে বাড়িতে উঠেছিল, সেই বাড়িতে একজন বৃদ্ধ শিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর শিকার-জীবনের গল্প বলেছিলেন—তিরিশ বছর আগেকার কথা, প্রদীপ মনে মনে সেই শিকার পার্টিতেই অংশ গ্রহণ করে ফেলেছিল।

আমি প্রদীপকে বিশেষ পাত্তা দিলাম না। রাজী হলাম না ওর বন্ধু কমলজ্যোতির বাড়িতে যেতে। তার ফলে আমার একটা ক্ষতি হল এই, আগে প্রায় প্রত্যেক দিনই সন্ধ্যেবেলা প্রদীপের সঙ্গে দেখা হত আমার। এখন আর প্রদীপকে পাওয়া যায় না। ও কমলজ্যোতির বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে। মনে মনে কমলজ্যোতির ওপরে রেগেই রইলাম আমি।

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তক্ষুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। ম্লান আকাশের নিচে কলকাতা শহরটা নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে। একলা একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মনে হয়, আমি মনুষ্য-সমাজ থেকে বিতাড়িত। আমি একা একটা সিনেমা দেখতে পারি না, একা রেস্তোরাঁয় ঢুকে চা খেতেও পারি না।

অপরপক্ষে, অল্পচেনা বা নতুন চেনা মানুষের সংসর্গে স্বস্তিবোধ করি না আমি। রাস্তায় মুখচেনা কোনো মানুষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কেউ কেউ বলে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক! আমি তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভাণ দেখিয়ে বলি, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে, আমি অন্য-দিকে যাব। কেউ যদি চায়ের দোকানে ডাকে, আমি চা-পান সম্পর্কে দারুণ একটা বিতৃষ্ণা দেখাই।

মাধুরী পাটনায় গেছে, এখনো ফেরে নি। প্রত্যেকদিন টেলিফোন করে ঐ একই উত্তর শুনতে পাই। হিমাংশু আর দেবব্রতদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিতাম মাঝে মাঝে। কিন্তু হিমাংশুর জ্যাঠামশাইয়ের খুব অসুখ, ওদের বাড়িতে সব সময় একটা থমথমে অবস্থা, সেখানে আর যাওয়া যায় না। দেবব্রতর

ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সুতরাং ও বাড়িও এখন আড্ডার জন্য উপযুক্ত নয়। দু'একদিন গিয়ে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দেখানো যায়, রোজ যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, শুভব্রতর বাড়িতে যাওয়া যাক। শুভব্রত সন্ধের পর সাধারণত বাড়িতে থাকে। নিজের হাতে রেডিও বানানোর শখ শুভব্রতর। অফিস থেকে ফিরে ঐসব যন্ত্রপাতি নিয়েই নাড়াচাড়া করে। ঐ বাড়িতেই আবার থিয়েটারের রিহার্শাল হয়। শুভব্রতর বোন মল্লিকা থিয়েটারের নামে পাগল—নিজেই পরিচালনা করে একটা অ্যামেচার দল। সেখানে গেলেও আমি কিছুটা খাতির পাই। নিজে আমি কক্ষনো থিয়েটার করি না। কিন্তু দু'একটা উপদেশ টুপদেশ দিতে পারি অনায়াসেই।

শুভব্রতর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেদিন কোন কারণে রিহার্শাল বন্ধ, মল্লিকা বাড়িতে নেই। শুভব্রত জামা-টামা পরে কোথায় বেরুচ্ছিল তক্ষুনি। আমাকে দেখে বললো, এসেছিস? চল্—

—কোথায়?

—কমলজ্যোতির বাড়িতে। আজ ওখানে গান বাজনা হবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুইও কমলজ্যোতিকে চিনিস নাকি?

—এই তো ক'দিন আগে আলাপ হলো। কেন, প্রদীপ তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় নি?

আমি একটু অপমানিত বোধ করলাম। কোথাকার কে কমলজ্যোতি তার ঠিক নেই, তার সঙ্গে আলাপ করে কি আমি ধন্য হয়ে যাব নাকি? আমি কার সঙ্গে আলাপ করবো না করবো, সে ব্যাপারে আমার নিজস্ব নির্বাচন থাকবে। তা ছাড়া আমি মোটামুটি বিখ্যাত লোক। অপরের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করা কি আমাকে মানায়?

আমি বললাম, না, আমি যাব না। তুই যা।

—চল্, চল্।

—না রে, আমার ভীষণ কাজ আছে।

—কি ভীষণ কাজ! চল্ না! দেখিস বেশ জমবে। আমি একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে যাচ্ছি।

—না ভাই, অচেনা কারুর বাড়িতে আমি এরকম ভাবে যেতে পারবো না।

—অচেনা কি রে? ও বাড়িতে এমনিই অনেকে যায়। তুই গেলে খুশি হবে। ও বাড়িতে তোর চেনাশুনা অনেককে পাবি। প্রদীপ তো থাকবেই, তাছাড়া হিমাংশু আর বরুণা, বরুণার ছোট বোন শুভশ্রী—

শুভব্রত আমাকে ছাড়লো না। ওর সদাসঙ্গী মোটর বাইকের পেছনে তুললো আমাকে। হিমাংশুর স্ত্রী বরুণার বিয়ের আগে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল শুভব্রতর সঙ্গে। কি কারণে বরুণার সঙ্গে শুভব্রতর বিয়ে হয়নি আমি ঠিক জানি না। হয়তো বরুণার সম্পর্কে এখনও দুর্বলতা আছে শুভব্রতর, সেই কারণেই শুভব্রত ওখানে যাবার জন্য উৎসাহী।

লিটল রাশেল স্ট্রিটের একটা বড় বাড়ির সামনে এসে শুভব্রতর মোটর সাইকেল থামলো। কোন রাস্তার নাম শুনেই সেই পাড়ার বাড়িগুলো কি হবে, তা নির্ভুলভাবে বলা যায় না কলকাতায়। বনমালী নস্কর লেনেও যেমন দেখা যেতে পারে বিরাট একটা প্রাসাদ, তেমনি লিটল রাসেল স্ট্রিট ধরনের রাস্তার সব বাড়িই সাহেবী কায়দার নয়।

এই বাড়িটা আকারে বেশ বড়, কিন্তু বহু পুরোনো আমলের। দেয়াল নোনা ধরা, ভেতরে এখনও কাঠের সিঁড়ি। বাড়িওয়ালা এই বাড়িটা ভেঙে ফেলে অনায়াসেই তো ব্যাঙ্কের কাছ থেকে লোন নিয়ে এখানে একটা দশ-বারো তলা বাড়ি তুলে ফেলতে পারে। বাড়িওয়ালা কেন সেটা করছে না সেটা বুঝতে পেরেছিলাম কয়েকদিন বাদে।

কাঠের সিঁড়িতে কার্পেট পাতা। বহুকাল আগেকার কার্পেট এখন ছিন্নভিন্ন, পা দিলেই ধুলো ওড়ে। উঠতে হলো ছ'তলায়। লিফটের ব্যবস্থা আছে বটে, এখন খারাপ। দেখে মনে হলো, প্রায়ই খারাপ থাকে।

চওড়া কাঠের দরজা, তার বাইরে ইংরেজিতে লেখা, কমলজ্যোতি চাটার্জি। সুইট নাম্বার টুয়ালভ্। ইন!

দরজার বাইরে উর্দিপরা একজন বৃদ্ধ মুসলমান বসে ছিলেন। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলেন।

দরজা খুলতেই দেখলাম, ভেতরে অনেক লোক। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। সেকেলে আমলের কয়েকটা সোফা আর মোটা মোটা চেয়ার সারা ঘরে ছড়ানো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুভব্রত বললো, এই কমলজ্যোতি, আমাদের আর এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।

একটি বেশ ফর্সা, লম্বা চেহারার যুবক এগিয়ে এসে বলল, কাম অন ইন!

ছেলেটি দেখতে বেশ সুপুরুষ। ছিপছিপে, ধারালো মুখ, মাথা ভর্তি আধা কোঁকড়ানো এলোমেলো চুল। তবে, মুখখানা জ্বলজ্বল করছে, চোখ লালচে। দেখলেই বোঝা যায় নেশা করেছে খুব।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ নাটকীয় কায়দায় নিজের বুকে হাত রেখে বললো, এই অধমের নাম কমলজ্যোতি। শুধু কমল বা শুধু জ্যোতি বললে আমি চটে যাই, আমার নাম পুরোপুরি কমলজ্যোতি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার বলো তোমার নাম কি?

আলাপ হবার আগেই কেউ আমাকে তুমি সম্বোধন করবে, এ রকম শোনার অভ্যেস আমার নেই। তবু, আমি বিরক্ত হলুম না। কারণ আমি আদব-কায়দা পছন্দ করি না—দু'জন সমবয়সী পুরুষ প্রথম থেকেই পরস্পরকে তুমি বললে এমন কিছু দোষ নেই তাতে। আমি আমার নাম বললাম।

কমলজ্যোতি জিজ্ঞেস করলো, তুমি গান জানো ?

আমি হেসে বললাম, না।

কমলজ্যোতি গলা উঁচু করে শুভব্রতকে জিজ্ঞেস করলো, এ তো গান জানে না। তাহলে এ মক্কেলকে এনেছো কেন !

শুভব্রত রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, না না, যে গান গায় সে তো নিশীথ গাঙ্গুলি। এ হচ্ছে সুনীল, আমাদের বিশেষ বন্ধু, লেখক—

—ওসব লেখক-টেখক আমি বুঝি না।

শুভব্রত অস্বস্তিতে পড়লেও আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে-ছিলাম। এ এক ধরনের বিলিতি রসিকতা। আধুনিক কায়দায়। প্রথম আলাপেই অতিরিক্ত বিনয় বা সৌজন্য না দেখিয়ে রূঢ়তা দেখানো।

আমি কমলজ্যোতিকে বললাম, তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি গান-টান কিছু বোঝ না। তুমি হঠাৎ গান শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছো কেন ?

—আমি গান বুঝি না, তা ঠিক। কিন্তু আমি গান ভালবাসি।

—কি ধরনের গান।

—শুধু বাংলা গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত, কীর্তন—

—কিন্তু তোমার উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে তুমি ভালো বাংলা জানো না, শিখছো নতুন নতুন।

—দ্যাট্‌স রাইট। শিখছি। শেখার মধ্যে কোন দোষ আছে ?

প্রদীপ উঠে এসে আমাকে বললো, কী রে এসেছিস ?

কমলজ্যোতি বলল, হ্যাঁ, এসেছে। এসে আমাকে একেবারে কৃতজ্ঞ করে দিয়েছে।

আমি হেসে বললাম, ও জায়গায় কৃতজ্ঞ কথাটা ঠিক হল না। ওখানে হবে কৃতার্থ করে দিয়েছে !

কমলজ্যোতি তীব্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি ভুল বলেছি ?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই !

—ঠিক আছে, শিখে নিলাম : কৃতার্থ !

কমলজ্যোতি আমার বাহু চেপে ধরেছে। টানতে টানতে নিয়ে এলো ঘরের এক কোণে। একটা ছোট টেবিলের ওপর অনেকগুলো বোতল রাখা, তার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে কমলজ্যোতি জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট উইল য়্যু হ্যাভ? হুইস্কি? রাম? জিন অ্যাণ্ড টনিক? ফর গডস্ সেক, ডোনট সে, আই ডোনট ড্রিংক! গান গাইতে পারো না, আবার যদি মদ খেতেও না পারো, তাহলে আমি তোমাকে টলারেট করতে পারবো না।

এইভাবে কমলজ্যোতির সঙ্গে আমার পরিচয়। কমলজ্যোতির ঘরে আমার অন্যান্য বন্ধুরা অনেকেই জড়ো হয়েছিল। ঐ রকম নিরিবিলি পাড়ায় ছ'তলার উপরে একটা ফ্লাট, গুরুজনদের চোখ থেকে অত দূরে অড্ডার পক্ষে আদর্শ জায়গা। গানের নামে কোরাসে চেঁচামেচি করলেও আপত্তি জানাবার কেউ নেই। তাছাড়া কমলজ্যোতি জলের মতন পয়সা খরচ করে। নানারকম অ্যাল-কহলিক পানীয় ওর কাছে সব সময় মজুত, মেয়েদের জন্য সরবৎ-কোকাকোলা আনাচ্ছে অনবরত, ওর বাবুর্চি নানারকম খাবার বানাচ্ছে।

সবাই যে এখানে অন্যের পয়সায় আনন্দ-ফূর্তি করতে যেত, তা অবশ্য নয়। অনেকেই আপত্তি জানিয়েছে, নিজেরা কিছু খরচ করতে চেয়েছে—কমলজ্যোতি কান দেয় নি। কথা বলার সময় অত্যন্ত জোর দিয়ে কথা বলে ও, ইংরেজী শব্দের ঠিক বাংলা মানেটা মনে না এলে একটু তোতলা হয়ে যায়। অন্যের কথা সে শুনবেই না কিছুতে। কমলজ্যোতির চরিত্র যে বিচিত্র এবং আকর্ষণীয়, তা মানতেই হবে।

আড্ডা জমে ওঠার পর বরুণা আর শুভশ্রী যখন গান গাইছে তখন কমলজ্যোতি নিজেও চেঁচিয়ে ওদের সঙ্গে গান জুড়ে দিল। ওর গলায় একদম সুর নেই, বাংলা উচ্চারণ সব ঠিক হয় না, তবু ওর উৎসাহ অপরিসীম।

সেই গান শুনলে হাসি চাপা মুস্কিল। কেউ কেউ হাসছিল। তবু কমলজ্যোতি দমে না।

সেদিন ওখান থেকে ফেরার পথে আমি শুভব্রতকে জিজ্ঞেস করলাম, কমলজ্যোতির মা গায়িকা ছিলেন, সেইজন্য বুঝি কমল-জ্যোতির গানের প্রতি এতটা টান? আহা বেচারা, নিজে একদম গাইতে পারে না!

শুভব্রত বললো, ওর মা গায়িকা বুঝি? কি নাম?

—তা তো আমি জানি না। প্রদীপ বলছিল।

—ছাড় প্রদীপের কথা। আমি তো শুনেছি, ওর মাকে ও ভালো করে চোখেই দেখেনি। ওর যখন সাড়ে চার বছর বয়েস, তখন ওর বাবার সঙ্গে ওর মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

—তখনকার দিনে বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল নাকি?

—ছিল একটা জোড়াতালির ব্যাপার। ওর মা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে যায়। তাতে বিয়ে ভেঙে যায়। তারপর উনি একজন খ্রীস্টানকে বিয়ে করেন।

—এটা তোকে কে বলেছে? কমলজ্যোতি নিজে?

—হ্যাঁ।

—রীতিমত রোমাঞ্চকর ব্যাকগ্রাউণ্ড। কমলজ্যোতি নিজেই এসব বানিয়ে বলে নি তো?

—যাঃ, নিজের বাবা-মা সম্পর্কে কেউ বানায়? তুই আরও কয়েকদিন মিশলে দেখতে পাবি, ছেলেটার মধ্যে ভয়ংকর একটা চাপা দুঃখ আছে। আমাদের মতন সামাজিক পরিবেশ তো পায় নি কখনো। এতকাল বিলেতে কাটিয়েছে।

—যারা বহুকাল বিলতে কাটায়, তারা সাহেবী ধরনেরই হয়ে যায়। ও আবার কলকাতায় আসে কেন?

—বাংলা শেখার ইচ্ছে, বাংলা গানের প্রতি আগ্রহ—সেটাকে তুই খারাপ বলতে পারিস না—

—না, খারাপ বলছি না। তবে বেশ অদ্ভুত।

॥ ২ ॥

আর দু'তিনদিন দেখা হবার পর কমলজ্যোতির সঙ্গে আমার রীতিমত বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ছেলেটার মধ্যে খানিকটা শিশুর মত প্রাণশক্তি আছে, কিছুতেই এড়ানো যায় না।

সব সময় আড্ডা আর হৈ-চৈ ছাড়া যেন ও বাঁচতে জানে না। ওর ঘরে যে কোন সময় গেলেই দেখা যায়, হয় মদ্যপান অথবা কোরাস গান চলছে। খুব একটা খারাপ লাগে না।

একদিন রাত্তির সাড়ে বারোটার সময় কমলজ্যোতি আমার বাড়িতে এসে হাজির। রাস্তা থেকে আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলো। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, উঠে দরজা খুলতেই হলো। বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম, মনে হয়েছিল, কমলজ্যোতি মাতাল হয়ে এসে হল্লা করছে। ধমকে দিতে হবে, আমার বাড়িতে এসব চলবে না।

দরজা খুলে দেখলাম, কমলাজ্যোতি মাতাল নয়। খানিকটা উদভ্রান্ত চেহারা। এত রাত্রে এসে সে ডাকাডাকি করছে, এটা যেন কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

আমাকে বললো, শুয়ে পড়েছিলে নাকি? একটু চা খাওয়াবে? খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। সব দোকান বন্ধ—আমার বাবুর্চিটার অসুখ।

—ধ্যাৎ। এত রাত্তিরে আবার চা কি!

—তা হলে কি হুইস্কি খাওয়াতে চাও? আমার হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললাম, চুপ। আমার বাড়িতে অনেক লোকজন আছে। তোমার মতন তো একলা থাকি না। এখানে ওসব হবে না।

—কিন্তু চা তো নির্দোষ জিনিস। চা খেতে আপত্তি কি?

—এত রাত্তিরে চা হয় না। তোমার বাবুর্চির অসুখ বলে তুমি নিজে চা-ও বানাতে পারো না?

—না, পারি না। ঠিক আছে, এবার থেকে শিখে নেবো। চলো, তুমি আমার সঙ্গে চলো—একটু বেড়ানো যাক্।

—এখন কোথায় বেড়াবো? তোমার কি মাথা খারাপ? কলকাতা শহর তোমার লণ্ডন নয়—এখানে রাত্তিরবেলা ঘুরলে কেউ এসে কুচ করে গলাটা কেটে দেবে। এক সময় আমিও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরেছি।

—আমাদের কে কি করবে? আমাদের সঙ্গে তো টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু নেই। যদি কেউ এসে চায়, দিয়ে দেবো। চলো, চলো—

—না, ভাই। এখন না।

—আরে সুনীল, তুমি ভয় পাচ্ছো? চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে বাইরে, এই তো বেড়াবার সময়। আজ আমার ওখানে কেউ আসে নি, সন্ধ্যাবেলা থেকে একা একা, অসহ্য লাগছিল—তাই বেরিয়ে পড়লাম—

—আজ সন্ধেবেলা তুমি একা ছিলে?

—হ্যাঁ। কেউ আসে নি আজ।

—কেন? আশ্চর্য ব্যাপার তো!

—বন্ধুরা কি আমার ওপরে রাগ করেছে? তুমি?

আমাকেও বেরিয়ে পড়তে হলো কমলজ্যোতির সঙ্গে। বাড়ির কারুকে কিছু না বলে। এক সময় আমরা বন্ধুরা মিলে বহু রাত পর্যন্ত, কখনো কখনো সারা রাত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছি। সেই কলকাতা আর নেই। কিংবা আমরাই বদলে গেছি!

কমলজ্যোতির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার পর ভালোই লাগতে লাগল। সত্যি বাইরে চমৎকার বাতাস। আকাশটা পরিষ্কার। রাস্তাঘাট জনশূন্য। মাঝে মাঝে দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সি আর পুলিশের গাড়ি।

আমরা বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলাম রাস্তার মাঝখান দিয়ে, কেউ কিছুই বললো না।

কমলজ্যোতিকে কিন্তু এখন খানিকটা গম্ভীর লাগছে। কি ব্যাপারে যেন চিন্তাক্লিষ্ট। গম্ভীর অবস্থায় ওকে একদম মানায় না। আমিও জিজ্ঞেস করলাম না কিছু।

সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। একটা পানের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু আলো জ্বলছে। দোকানদারকে ডেকে ঝাঁপ খোলালাম। কমলজ্যোতি বললো, দেখলে তো, ইচ্ছে করলে রাত্তিরেও সব কিছু পাওয়া যায়। রাত্তিরটাকে লোকে মিথ্যে ভয় পায়।

—এমন জায়গাও আছে, যেখানে সারারাত অনেক দোকান খোলা থাকে।

—কোথায়?

—নিমতলা শ্মশানে।

—তাই নাকি? আমি কখনো শ্মশানে যাইনি চলো, যাবে?

—আজ না, আর একদিন। শ্মশান খুব সুন্দর জায়গা।

কমলজ্যোতি অকারণে হো-হো করে হেসে উঠলো।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি হাজরা রোড। কমলজ্যোতি হঠাৎ বললো, ডান দিকে চলো!

—কোথায়?

—চলোই না।

ডান দিকে কিছুদূর এসে কমলজ্যোতি একটা গোলাপি রঙের দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। আঙুল তুলে বললো, এই বাড়িতে কে থাকে জানো?

—কে?

—আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু।

—সে আবার কে? কি করেছে তোমার?

—তা বলবো না। ঐ ছাখো দোতলার কোণের ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে এখনো ও জেগে আছে। আমার কি ইচ্ছে

হচ্ছে জানো! আমার ইচ্ছে হচ্ছে, দারজা ভেঙে আমি ঐ দোতলায় উঠে যাই। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—মাথা খারাপ নাকি? আমি রাত-দুপুরে লোকের বাড়িতে ডাকাতি করবো?

কমলজ্যোতির চোখ-মুখ কঠিন হয়ে গেল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, দোতলায় সেই আলো-জ্বালা ঘরের দিকে। আপন মনে বললো, না, আমি ডাকাতি করতে চাই না। তা হলে অনেক আগেই করতাম।

আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম দরজায় কাদের নেমপ্লেট। দু-তিনটে নাম আছে, তার মধ্যে একজন বিলেতফেরৎ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এ. কে. সেনগুপ্ত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? তোমার সঙ্গে কি এই ভদ্রলোকের বিলেতে চেনাশুনো ছিল?

কমলজ্যোতি কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললো, চলো যাওয়া যাক। সারারাত রাস্তায় কাটাবো নাকি? বাড়ি ফিরতে হবে না?

॥ ৩ ॥

বিশেষ কাজে দিন সাতেকের জন্য আমাকে আসামে যেতে হলো। কিন্তু সাত দিন পরেও ফেরা হলো না। ত্রিপুরায় শান্তনু চাকরি করে। খবর পেয়ে শান্তনুও অফিসের কাজের ছুতোয় চলে এলো শিলচরে। বললো, চল্ হাফলং-এর ডাকবাংলোয় গিয়ে ক'দিন কাটিয়ে আসা যাক্। চমৎকার জায়গা।

আমরা বন্ধুরা এখন সবাই প্রায় চাকরিতে ঢুকে পড়েছি, কেউ কেউ সংসারীও হয়েছে। কিন্তু দেখা হলে প্রথম যৌবনের সেইসব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। তখন সংসার কিংবা চাকরি-বাকরির কথা ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

শান্তনু আজকাল খুব রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। চাকরি-টাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি মানুষের মুক্তির বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে

এরকম ভাবছে। আমাকে বললো, তোর সঙ্গে এই চারদিন হাফলং-এর বাংলোয় কাটিয়ে আমার লাভ হলো কি জানিস? মাথাটা একটু পরিষ্কার হলো। এ ক'দিন রাজনীতির কথা একেবারেই বলি নি। সব সময় একটা জিনিস নিয়ে ভাবলে মাথাটা জ্যাম হয়ে যায়, যুক্তি বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। যারা গভীরভাবে রাজনীতি করে, তাদের উচিত, মাঝে মাঝে দু' একদিনের জন্য ওসব ভুলে ছবি আঁকা কিংবা গান-টান শুনে সময় কাটানো। এই জন্যই বোধহয় মাও সে তুং কিংবা হো চি মিন কবিতা লিখতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শান্তনু, তুই এখন আর কবিতা লিখিস না?

—নাঃ! পারি না। লিখতে গেলেই প্রেমের কবিতা এসে যায়। ওসব আর কোনো মানে হয় না লেখার!

—প্রেমের কবিতায় আর কোনো মানে হয় না বুঝি? তার মানে প্রেম নেই? শুধু খাওয়া-পরা আর বেঁচে থাকার অধিকারের নামই মানুষের মুক্তি?

—ওসব পরের কথা। আগে খাওয়া-পরা বেঁচে থাকার অধিকার সবাই সমানভাবে পাক, তারপর ওসব হবে।

—অর্থাৎ এখন কয়েক বছর কেউ কাউকে ভালবাসবে না?

—তুই-ও আবার বাজে তর্ক আরম্ভ করলি?

—আচ্ছা শান্তনু, তোকে অন্য একটা কথা বলি। একজন মানুষ যদি নিজের ইচ্ছে মতন নিজের জীবনটা খরচ করে, কিংবা ধরা যাক, নষ্ট করে, তা হলে সে সম্পর্কে কারুর কি কিছু বলার থাকতে পারে?

—নিশ্চয়ই। সে যে সমাজে বেঁচে আছে, সেখান থেকে সে অনেক সুযোগ সুবিধে নিচ্ছে—তার বদলে সে কিছুই দিচ্ছে না—এইটাই একটা অপরাধ।

—সমাজ-ছাড়া মানুষও তো হয়। যে সব সাধু-সন্ন্যাসী পাহাড়ে পর্বতে থাকে—

—তারা থাক্। তাদের জন্য চিন্তা নেই।

—রিসেণ্টলি একটা ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, বুঝলি। ছেলেটার নাম কমলজ্যোতি। এর কেসটাই ধর। বেশ রহস্যময়। ছেলেটার চেহারা সুন্দর, বিলিতি ডিগ্রি আছে, ইচ্ছে করলেই একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে সুন্দর মতন কোন মেয়েকে বিয়ে করে মোটামুটি সো-কল্ড সুখী জীবন পেতে পারে। কিন্তু ছেলেটা শুধু বাউণ্ডুলেপনা করে। রোজই প্রায় বন্ধুদের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে পার্টি দেয়—মাঝে মাঝে সারা রাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকে—তুই একে কি বলবি? এ তো কারুর ক্ষতি করছে না—শুধু নিজেরই ক্ষতি করছে। একে কি নিন্দে করা যায়?

—তোর কাছে কি এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার? তা হলে তো যে আত্মহত্যা করে, সেও তোর কাছে ভালো।

—আকাশ থেকে যখন একটা তারা খসে পড়ে, সেটাও তো একটা মৃত্যু। একটা কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া—কিন্তু দেখতে ভালো লাগে।

কমলজ্যোতির সব কথা শুনে শান্তনু বললো, যা মনে হচ্ছে, ছেলেটার সঙ্গে তোর বেশি মেলামেশা না করাই ভালো। ছেলেটা খুব সম্ভবত স্পাই কিংবা সি আই এ'র দালাল। ওরা এই রকম টাকা-পয়সা খরচ করে লোককে হাতে রাখার চেষ্টা করে। অথবা ছেলেটা মানসিকভাবে অসুস্থ।

শান্তনুর কথাটা আমার একটুও মনঃপূত হলো না। আমরা যে-সব মানুষকে বুঝতে পারি না তারই ঘাড়ের ওপর কিছু একটা চাপিয়ে দিই। হয় সে মহানুভব অথবা চোর বা দালাল। কমলজ্যোতির সম্পর্কে এর কোনো কথাটাই ঠিক মত খাপ খায় না।

আসাম থেকে ফিরে আমি মাধুরীকে পেয়ে গেলাম। মাধুরী পাটনা থেকে ফিরেছে আমারও আগে। সুতরাং সন্ধ্যেবেলা

কমলজ্যোতির ফ্লাটে যাবার দরকার হয় না আমার। মাধুরীর সঙ্গে দেখা হলে আইনস্টাইনের থিয়োরি প্রমাণিত করে গোটা সঙ্কোটা উড়ে যায় এক নিমেষে।

মাঝে মাঝে উড়ো খবর পাই, বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই গিয়ে আড্ডা জমিয়েছে কমলজ্যোতির ফ্লাটে। কমলজ্যোতি প্রায় প্রতিদিনই পার্টি দিচ্ছে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া ও গান-বাজনা। এক-একদিন পঁচিশ-তিরিশ জন ছেলে-মেয়ে কমলজ্যোতির ফ্লাটে। ওর ঘর ভর্তি হয়ে যায়। তবে, একথাও শুনতে পাই, কমলজ্যোতি ঠিক দুশ্চরিত্র স্বভাবের নয়। মেয়েদের প্রতি ওর সম্মানবোধ খুব তীব্র। সব সময় বিলিতি সৌজন্য রেখে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে।

একদিন মাধুরীর সঙ্গে একটা সিনেমা দেখে বেরুচ্ছি হঠাৎ কমলজ্যোতির সঙ্গে দেখা। খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরে বললো, কি ব্যাপার, তুমি আমাকে অ্যাবানডান করলে কেন?

আমার মনে পড়লো শান্তনুর কথা। কমলজ্যোতি যদি সত্যই স্পাই হয়? স্পাই শুনলেই কী রকম যেন ভয় ভয় করে।

আড়ষ্টভাবে বললাম, না, মানে আজকাল আর সময় পাইনা।

—সময় পাওনা? সব সময় এত কিসের ব্যস্ত?

কমলজ্যোতি মাধুরীকে দেখতে পায়নি। কিংবা দেখলেও ওযে আমার সঙ্গে আছে, সেটা বুঝতে পারে নি। বুঝতে পেরে সসম্ভ্রমে বললো, ও, আ অ্যাম সরি! আপনাদের ডিসটার্ব করলাম!

মাধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম কমলজ্যোতির। মাধুরী ওর কথা আগে একটু একটু শুনেছে। মাধুরীর বেশ আগ্রহ আছে ওর সম্পর্কে মনে হলো। বাউণ্ডুলে ছেলেরা সমাজে মূল্য পায় না, কিন্তু মেয়েদের বেশ দুর্বলতা থাকে ওদের সম্পর্কে।

আলাপ হবার পর কমলজ্যোতি বললো, আপনারা কি এখন খুব ব্যস্ত? কোথাও যাবার কথা আছে? নইলে চলুন না আমার ওখানে গিয়ে একটু বসবেন। বেশী দূরে তো নয়।

আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মাধুরী ততক্ষণে নিমরাজি। বোধহয় ব্যাচেলার বাউণ্ডুলের ঘর কি রকম হয়, সেটা দেখার জন্য ওর কৌতূহল।

আমি কমলজ্যোতিকে বললাম, আজ সন্ধ্যেবেলা এমন সময় তুমি রাস্তায় যে? তোমার ওখানে সবাই জমায়েত হয়নি?

ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে ও উত্তর দিল, না, কয়েকদিন ধরে বিশেষ কেউ যাচ্ছে না। আমি একা একা ঘরে বসে থাকতে পারিনা কিছুতেই। আমার অসহ্য লাগে। তোমরা একটু চলো না। বেশীক্ষণ আটকাবো না।

চলে এলাম কমলজ্যোতির বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হলো, শান্তনুর কথাটা বাজে। কমলজ্যোতি যদি স্পাই হয়, তা হলে সরকারী হোমরা-চোমরাদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গে মেশার এত আগ্রহ কেন? আমাদের কাছ থেকে কি পাবে?

কমলজ্যোতির ফ্ল্যাটের দরজা খোলার পর ভেতরে ঢুকে আমি অবাক। সেই সোফা কৌচ চেয়ার টেবিল ইত্যাদি কিছুই নেই। ঘরের মাঝখানে শুধু একটা খাট পাতা।

—কি ব্যাপার, তোমার সব ফার্ণিচারগুলো কোথায় গেল!

হাসতে হাসতে কমলজ্যোতি উত্তর দিল; সব হাওয়া।

—তার মানে? চুরি হয়ে গেছে।

—না, না, চুরি হয়নি। বাড়িওয়ালা নিয়ে গেছে।

মেয়েরা সাধারণত অপরিচিত লোকেদের বাড়িতে গিয়ে খাটে বসেনা। মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে। কমলজ্যোতি সেটা বুঝতে পেরে কোথা থেকে একটা টুল জোগাড় করে আনলো। সেটার ধুলো ঝেড়ে মাধুরীকে বললো, আপনার একটু কষ্ট হবে অবশ্য—

মাধুরী ভদ্রতা করে বললো না, না, কষ্ট হবে কেন?

কমলজ্যোতি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এখন আমার ঘরে আড্ডা বসলে ফ্লোরে বসেই হয়! ফার্নিচারগুলো সব বাড়িওয়ালার

ছিল। আমি দু'মাসের ভাড়া দিইনি তো—তাই সব নিয়ে গেছে। আমাকে তোলার জন্য কেস করছে—

—এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত?

—একশো কুড়ি টাকা।

—মাত্র? এই রকম পাড়ায়—

—ব্যাপারটা কি জানো। এই ফ্ল্যাটটা আমার কাকার নামে ভাড়া ছিল—অনেকদিন আগে। আমার কাকা যে মারা গেছেন, সেটা বাড়িওয়ালা জানে না। জানতে পারলে আমাকে খুব সহজেই তুলে দিতে পারে। এ বাড়ীর বেশির ভাগই পুরোনো ভাড়াটে। ভাড়া খুব কম।

—তাই বাড়িটার যত্ন নেই কোনো।

কমলজ্যোতি বললো, দাঁড়াও একটু আসছি আমি। এক্ষুণি আসবো।

মিনিট দশেকের মধ্যে কমলজ্যোতি একগাদা খাদ্য আর পানীয় এনে হাজির করলো। ওর বাড়ির কাছেই একটা ভালো রেস্তোরাঁ আছে।

মাধুরী এত খাবার-টাবার আনার জন্য খুবই আপত্তি জানাতে লাগলো।

কমলজ্যোতি অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললো, আপনি এই প্রথম এলেন তো! আমার বাবুর্চিটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি, তাই আমাকে নিজেই আনতে হলো। জানো সুনীল, এখন আমি নিজেই চা বানাই। এমনকি ভাতটাতও রাঁধতে পারি।

বুঝতে পারলুম, কমজ্যোতির টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছে। দিনের পর দিন অত পয়সা খরচ করলে রাজা মহারাজারাও আজকাল কুলোতে পারে না। সামান্য একশো কুড়ি টাকা ভাড়া দিতে পারছে না, তখন অবস্থা খুবই খারাপ। আমি বললাম, যাঃ, তুমি এতগুলো টাকা খরচ করে এসব কিনে আনলে কেন বলো তো?

—আরেঃ, তুমি কি আমাকে একেবারে গরীব ভাবলে নাকি? একটু খাবারও কিনতে পারবো না? আমার বাবার সাকসেশান সার্টিফিকেটটা এখনও বেরোয়নি, তাই ব্যাঙ্কের টাকা কিছু পাচ্ছিনা। কদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কথাবার্তা সেরকম আর জমলো না। কমলজ্যোতির ঘরে আগে যতবার এসেছি, অনেক ভিড় দেখেছি। এখন আমরা তিনজন মাত্র, তাই বেশ ফাঁকা লাগছে।

কমলজ্যোতি মাধুরীকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি গান গাইতে পারেন? একটা গান করুন না!

মাধুরী বললো, আমি গান জানিনা।

—নিশ্চয়ই জানেন। একটা শোনান! কী সুনীল, উনি গান জানেন না?

আমি দুষ্টুমী করে বললাম, দারুন গান জানে। শিগগিরই সিনেমায় প্লে ব্যাক করবে।

বেশকিছুক্ষণ অনুরোধ উপরোধ ও মাধুরীর না না'র পর কমলজ্যোতি হাল ছেড়ে দিল। তারপর বললো আপনাদের তাহলে দুটো দারুন গান শোনাই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা রেকর্ড নতুন বেরিয়েছে।

খাটের তলা থেকে কমলজ্যোতি একটা রেকর্ড প্লেয়ার টেনে বার করলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, একা একা যখন অসহ্য লাগে খুব, রেকর্ড প্লেয়ারটা চালিয়ে দিই, মনে হয়, পাশে বসে আমাকে কেউ গান শোনাচ্ছে।

আমি বললাম, তুমি আর এরকমভাবে কতদিন থাকবে? চাকরি বাকরি কিছু করবে না?

একটু অন্যমনস্ক হয়ে কমলজ্যোতি বললো, চাকরি? হ্যাঁ, খুজতে হবে এবার।

রেকর্ডটা শুরু হতেই মাধুরী বললো, এটা মায়া সেনগুপ্তার গান না?

উদ্ভাসিত মুখে কমলজ্যোতি বলল, হ্যাঁ। আমার দারুন লাগে এর গান। আপনি আগে শুনেছেন?

মুচকি হেসে মাধুরী বললো, শুনেছি।

আমি অবশ্য মায়া সেনগুপ্তার গান আগে শুনিনি। মেয়েটির গলা বেশ ভালোই। তবে, এমন কিছু দারুণ নয়। কমলজ্যোতি চোখ বুজে শুনছে আর ভাবের ঘোরে দুলছে।

গান দুটো শেষ হবার পর মাধুরী বললো, মায়ার গান আপনার এত ভালো লাগে—ওকে বলতে হবে তো! মায়া আমার খুব বন্ধু।

কমলজ্যোতি চমকে উঠলো। ব্যগ্রভাবে বললো, আপনি চেনেন ওকে?

—হ্যাঁ অনেকদিন। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তারপর মায়া বিলেত গেল সাইকলজি পড়তে। ওখানেই বিয়ে করেছে।

কী যেন একটা ব্যাপার আমার মনে পড়ার কথা। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম সেটা মনে করতে না পেরে। একটু বাদেই মনে পড়লো। মাধুরীকে জিজ্ঞেস করলাম, মায়া সেনগুপ্তা কোথায় থাকে বলো তো।

—হাজরা রোডের কাছে—

—বুঝতে পেরেছি। ওঁর স্বামীর নাম এ কে সেনগুপ্ত? চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট?

—হ্যাঁ, খুব বড় চাকরি করে ওর বর—

আমি কমলজ্যোতির দিকে তাকালাম। কমলজ্যোতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কমলজ্যোতি, তোমার সঙ্গে এই মায়া সেনগুপ্তার বিলেতে আলাপ হয়েছিল, তাই না?

কমলজ্যোতি আস্তে আস্তে বললো, তখন ওর নাম ছিল মায়া রায়।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, মায়া রায়। আপনি চেনেন ওকে? ওর সঙ্গে দেখা হলে আপনার কথা বলবো।

কমলজ্যোতি বিমর্ষভাবে বললো, না, বলবেন না। উনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারবেন না।

ঠিক আছে, চলুন একদিন আমার সঙ্গে, নতুন করে আবার আলাপ করবেন।

—না, না—

— আপনি মায়ার গান ভালবাসেন। চলুন একদিন সামনা-সামনি ওর গান শুনবেন। ও সত্যি খুব ভালো গায়। ওর বরের সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন খুব চমৎকার লোক—

কমলজ্যোতি আস্তে আস্তে বললো, না, তার দরকার নেই। রেকর্ড শুনতেই আমার ভালো লাগে।

আমি ব্যাপারটা অনেকখানি অনুমান করতে পেরে বললাম, মাধুরী, আমার সঙ্গে একদিন মায়া সেনগুপ্তার আলাপ করিয়ে দিও তো। আমি ভদ্রমহিলাকে দেখতে চাই।

মায়া সেনগুপ্তার সঙ্গে আমার আলাপ হলো মাধুরীদের বাড়িতে। বেশ ছিমছাম শান্ত ধরনের মেয়ে। খুব একটা সুন্দরী বলা যায় না, তবে মুখে চোখে একটা আলগা লাবণ্য আছে, তাকালেই ভালো লাগে।

একটুও অহংকার নেই মেয়েটির। গান শোনাবার অনুরোধ করলেই একটার পর একটা গান গেয়ে যায়। শুধু যে গায়িকা হিসাবে সুনাম হয়েছে তাই নয়, মায়া সেনগুপ্তা যে লেখা-পড়াতেও ভালো এবং বিলেত ঘুরে এসেছে— ব্যবহারে তার চিহ্নমাত্র নেই।

আমি বেশীক্ষণ কৌতুহল চেপে রাখতে পারলাম না। একটু বাদেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কমলজ্যোতিকে চেনেন? আপনার গানের খুব ভক্ত?

মায়া সেনগুপ্তা অবাক হয়ে বললো, না চিনিনা তো। কে বলুন তো?

—কমলজ্যোতি চ্যাটার্জি। বিলেতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

—একদম মনে পড়ছেনা।

আমি মায়া সেনগুপ্তার চোখের দিকে খর চোখ রেখে বললাম, বিয়ে হয়ে যাবার পর আগেকার ছেলে বন্ধুদের নাম মনে রাখতে নেই, তাই না?

—যাঃ, ও নামে সত্যিই আমার কোন বন্ধু ছিল না।

—আপনার স্বামীর বন্ধু ছিল তা হলে?

—তাও মনে পড়ছে না! কি রকম দেখতে বলুন তো?

আমি কিছুটা বর্ণনা দেবার পরই মায়া সেনগুপ্তা বললেন, ওঃ হো কে. জে? তাই বলুন! ওর নাম যে কমলজ্যোতি তা কি করে জানবো? আপনি ওকে চিনলেন কি করে?

—ও এখন কলকাতায় থাকে।

মায়া সেনগুপ্তা একটু গম্ভীর হয়ে বললো, আমার ভালো লাগতো না। এক রকমের ট্যাঁস টাইপের ছেলে থাকে না? সেই ধরনের। বিলেত গিয়েই খুব সাহেব হয়ে যায়। নিজের ভারতীয় পরিচয়টা মুছে ফেলতে চায়। নিজের নামটাও ভালো করে বলতে চায় না। ও তো সব সময় বলতো, আমার নাম কে. জে. চ্যাটার্জি! কল মি কে. জে!

আমার মনে পড়লো কমলজ্যোতির সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমাকে বলেছিল, আমার নাম কমলজ্যোতি। শুধু কমলও নয়, শুধু জ্যোতিও নয়। আমার পুরো নাম না বললে আমি চটে যাই।

সামান্য হেসে আমি বললাম, ছেলেটা অনেক বদলে গেছে। ও বুঝি বিলেতে আপনাকে খুব জ্বালাতন করেছে।

—না, জ্বালাতন আর কি করবে। ওখানে গিয়ে প্রথম দিকে বন্ধু-বান্ধবের মুখে খুব নাম শুনতাম, কে. জে। কে. জে। ভাবতাম কে যে সেই লোকটা! তারপর একসময় পুজোর পর বিজয়া সম্মিলনী হলো একটা বাড়িতে। সেখানে ওকে দেখলাম। আমার তো ওর ভাবভঙ্গী দেখে খুব হাসি পেয়েছিল। কথায় বার্তায় পুরো সাহেব,

বাংলা বলেই না—কাঁটা চামচে ছাড়া ভাত খেতে পারে না, এই ধরনের লোকদের আমি সহ্য করতে পারি না।

—আপনি বুঝি অপমান করেছিলেন ওকে ?

—না, না, অপমান করবো কেন ? ছি ছি, আমাকে সেরকম ভাববেন না। তবে ওকে দেখলেই আমার হাসি পেয়ে যেত। মাঝে মাঝে বাঙালীদের বাড়িতে আমি গান গাইতে যেতাম, সেখানে দেখতাম ওকে। খুব বেশী আলাপ হয়নি। তা ছাড়া, ঐ ভদ্রলোক ভালো বাংলাই জানতেন না, পছন্দ করতেন না আমার গান—এসেই নানারকম বকবক শুরু করে দিতেন।

—ও কিন্তু আপনার গান দারুন ভালবাসে। আপনার রেকর্ড চালিয়ে শুয়ে থাকে বিছানায়।

—তা হলে পরিবর্তন হয়েছে বলতে হবে !

আমি একটুখানি চুপ করে থেকে সিগারেট ধরালাম। মাধুরী বললো, ভদ্রলোককে সেদিন দেখে আমার মনে হলো, একটা কিছু বড় পরিবর্তন হঠাৎ ঘটে গেছে ওর জীবনে।

মায়া সেনগুপ্তার এই কথাবার্তা স্পষ্টতই পছন্দ হচ্ছে না। শাড়ীর ভাঁজ ঠিক করে বললো, আমি এবার উঠবো। আমাকে আবার ক্লাস নিতে হবে।

আমি বললাম, আর একটু বসুন। আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করবো ? যদি কিছু না মনে করেন—

—হ্যাঁ, বলুন না।

—কমলজ্যোতি কি আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ?

মায়া সেনগুপ্তা খানিক্ষণ চুপ করে রইলো। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আপনার যদি এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে খারাপ লাগে, তা হলে থাক।

লজ্জার অরুণ আভা ছড়িয়ে গেছে মায়া সেনগুপ্তার মুখে। খুব নিচু গলায় বললো, হ্যাঁ। কি মুস্কিল বলুন তো ! কথা নেই বার্তা নেই, একদিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে ওর সঙ্গে দেখা—আমার সঙ্গে

কিছুটা হেঁটেই আমাকে বললো ও আমাকে বিয়ে করতে চায়! শুনেই আমার এমন হাসি পেয়ে গিয়েছিল—

আমি বললাম, এটা আপনার নিষ্ঠুরতা। বিয়ের প্রস্তাবে আপনি রাজী হতে না পারেন, কিন্তু মুখের ওপর হেসে ওঠা উচিত না—অফাটার অল, ছেলেটা এমনিতে ভালো—

—সেই কথাই তো বলছি। আমি তো সাধারণ মেয়ে। ও বিলেতে অনেকদিন ধরে আছে, ভালো চাকরি করে, অনেক মেম সাহেবের সঙ্গে পরিচয়।

—তাদের একজনকে অনায়াসেই বিয়ে করতে পারতো। আমার সঙ্গে ওর রুচিতে মেলে না, কালচারে মেলে না। তা ছাড়া উনি বিলেতেই সেট্‌ল করতে চান, আর আমি পড়াশুনো শেষ করেই পালিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত—

—তারপর কি হলো? আপনি রিফিউজ করার পর ও কি করলো?

—আরও অনেকবার আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। ঐ একই কথা বলেছেন। তখন যদি আমি একটু বিরক্তি প্রকাশ করে থাকি—সেটাকে কি আপনি নিষ্ঠুরতা বলবেন? আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, উনি হঠাৎ আমার জন্য এরকম করছেন কেন? আমি দেখতেও এমন কিছু সুন্দরী নই, তা আমি ভালোভাবেই জানি; মেম সাহেব বিয়ে করতে তো উনি পারতেনই, বাঙালী মেয়েও—বিলেতে অনেক বাঙালী মেয়ে আছে, অনেকেই সুন্দরী। অনেকেই বিলেতে সেট্‌ল করার সুযোগ পেলে বর্তে যায়—তা ছাড়া আপনার ঐ বন্ধু শুনেছি বেশ ভালো চাকরি করতেন—অনেক মাইনে। আমি শেষের দিকে খুব বিরক্ত বোধ করতাম।

—কখন কার যে কি মনে লেগে যায়, কেউ বলতে পারে না। কমলজ্যোতি বোধহয় আপনার মধ্যে এমন কিছু একটা পেয়েছিল।

—সত্যি কথা কি জানেন, অপূর্ব, মানে আমার স্বামী—ওর সঙ্গে আমার দেশে ফিরে এসে বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ

কে. জে'র জ্বালাতনের জন্যই আমরা তাড়াতাড়ি বিলেতে বিয়ে করে ফেললাম।

—কমলজ্যোতি কিন্তু এখন অনেক বদলে গেছে। এখন খুব ভালো বাংলা শিখেছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসে—এখন আর আপনি ওকে ট্যাঁস বলতে পারবেন না।

অন্যমনস্কভাবে মায়া সেনগুপ্তা বললো, বদল হয়ে থাকলে ভালোই তো!

—আপনাকে একটা অনুরোধ করবো? আপনি ওর সঙ্গে একদিন দেখা করবেন? মানে, ওকে নিয়ে আসবো আপনার কাছে—

—কেন?

—এমনিই। ও বোধহয় খুশী হবে। ও যে আর আগের মতন নেই -আপনি এটা দেখলে ও খানিকটা সান্ত্বনা পাবে।

—না। আর দেখা-টেখা না করাই ভালো।

ব্যর্থ প্রেমিকদের সম্পর্কে মাধুরীর খুব উৎসাহ। মাধুরী বললো, কেন রে মায়া, একদিন একটু দেখা করতে কি দোষ আছে? বেচারা যদি একটু সান্ত্বনা পায়—

মায়া সেনগুপ্তা দৃঢ় গলায় বললো, না।

॥ ৪ ॥

যারা অনেকদিন বিলেত টিলেতে থেকে এসেছে, তাদের দেখলে, আমরা যারা বিলেতে যাইনি, আমাদের মনে দু'রকম ভাব আসে। কখনো আমরা বিলেত সম্পর্কে নানারকম কৌতূহলী প্রশ্ন করি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সুখ সুবিধে বিষয়ে জানতে চাই। অথবা, এমন ভঙ্গি করি, বিলেত তো এখন জল ভাত, রাম, শ্যাম, যদু, মধুও ঘুরে আসছে, ও নিয়ে আর কথা বলার কি আছে! আজকাল এই দ্বিতীয় ভঙ্গিটাই প্রবল। বেচারা বিলেত

ফেরৎরা ইদানীং আর মনের সুখে বিলেতের গল্প বলারও সুযোগ পায় না।

কমলজ্যোতি আর প্রদীপের ব্যাপারটা আবার অন্যরকম। কমলজ্যোতি সব মিলিয়ে বারো কি চৌদ্দ বছর লণ্ডনে কাটিয়ে এসেছে, তার মুখে চোখে, পোষাকে, গায়ের রঙে, কথাবার্তায় এখনো নির্ভুল বিলিতি ছাপ। কিন্তু সে কখনো বিলেতের প্রসঙ্গ তোলে না। সে বরং তার বাল্যস্মৃতি খুঁড়ে জাগাতে চায়।

আর প্রদীপ কখনো বিলেতে যায় নি, এমন কি তার দূর সম্পর্কিত কোনো মামাও কোনোদিন বিদেশে কোথাও গেছে, এমন কথা শুনি নি, অথচ প্রদীপের মুখে সব সময় বিলেতের গল্প। প্রদীপের একমাত্র যোগ্যতা, সে কমলজ্যোতির বন্ধু।

অফিসের ছুটি হবার সময় হয়ে এসেছে, বেরুবার জন্য কাগজ পত্র গুছোচ্ছি, এমন সময় প্রদীপ এসে হাজির।

এসেই বললো, ডবল ডিমের অমলেট, টোস্ট আর চা বলতো! তোদের ক্যান্টিনে কি কেক রাখে?

আমি বললাম, না। খুব খিদে পেয়েছে? এখন আর অফিসে বসে থেকে কি হবে। চল, বাইরে বেরুনো যাক্।

প্রদীপ বললো, না, না, এখনো তো পাঁচটা বাজে নি। তোদের ক্যান্টিনের খাবার খুব চমৎকার। ফার্স্ট ক্লাশ প্রিপারেশন।

আমাকে হাসতে হলো। ওমলেট আর টোস্ট-এর রান্নার আবার কি বিশেষত্ব থাকবে।

প্রদীপ আমার হাসির অর্থ বুঝতে পেরে বললো, তোদের এখানকার ডিমের স্বাদই আলাদা। তাড়াতাড়ি অর্ডার দিয়ে দে। তোদের এখানকার খাবার কেন বেশী ভালো লাগে জানিস, তোকে তো পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না, সেইজন্য।

আমাদের ক্যান্টিনে শ্লিপ লিখে পাঠালেই খাবার আসে। প্রদীপকে একথা আর জানালুম না যে মাসের শেষে সবগুলো

স্লিপ যোগ করে মাইনে থেকে কেটে নেয়। পয়সা না নিয়ে খাবার দেবে—এমন কোনো অফিস স্বর্গে থাকতে পারে। মাটির পৃথিবীতে নেই।

প্রদীপ বেশ তৃপ্তি করে খেলো। তারপর বললো, চল্ এবার ওঠা যাক্। আমি বিকেলের দিকে রোজ কিছু খেয়ে নিই কেন জানিস! এর পর হুইস্কি টুইস্কি খেতে হলে, খালি পেট থাকা ভালো নয়, বুঝলি না?

আমি শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করলুম, হুইস্কি আবার কে খাওয়াবে?

—কেন কমলজ্যোতি ?

—তুই এখন কমলজ্যোতির বাড়িতে যাচ্ছিস্?

—না। ও আজ সাড়ে পাঁচটার সময় মেট্রোর সামনে এসে দাঁড়াবে আমার জন্য। দেরী না হয়ে যায়, চল্, চল—

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম খুব মিহি বৃষ্টি পড়ছে! বাতাসে মিশে আছে সূক্ষ্ম-জলকণা। এই রকম বৃষ্টিতে হাঁটতে অসুবিধে হয় না।

প্রদীপ বললো, টিপিক্যাল লণ্ডন ওয়েদার! না রে?

আমি কি করে জানবো! তাই বললাম, ইংরেজরা যখন এদেশে ছিল, তখন বোধ হয় বিলেত থেকে এরকম বৃষ্টি নিয়ে এসেছিল।

—আর ইংরেজরা এদেশ থেকে যত জিনিস ওদের দেশে নিয়ে গেছে, তার সব ডিটেইলস এখনও আমরা জানি না। কমলজ্যোতির মা যখন বাকিংহাম প্যালেসে ব্যাংকুয়েটে গিয়েছিলেন—

—গিয়েছিলেন বুঝি?

—আলবাৎ! ওর মা কত ফেমাস ছিলেন, তুই ধারণা করতে পারবি না। ডিউক অব এডিনবরা নিজে ওর হাত ধরে পাশে বসিয়েছিলেন, ফিসফিস করে বলেছিলেন, নাইটিংগেল অব ইণ্ডিয়ার পাশে বসেছি, এটা আমারই সৌভাগ্য—

—তুই এমন ভাবে বলছিস, যেন নিজের চোখে দেখেছিলি ?

একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে প্রদীপ বললে, নিশ্চয়ই দেখেছি নিজের চোখে। ছবিতে। লণ্ডন টাইমসে ছাপা হয়েছিল—

মেট্রো সিনেমার সামনে অত ভিড়ের মধ্যেও কমলজ্যোতিকে আলাদা ভাবে চোখে পড়ে। সাদা ধপধপে প্যাণ্টের সঙ্গে একটা কুচকুচে কালো রঙের সিল্কের সার্ট পরে আছে। কালো সার্ট পরা পুরুষ মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। ওর ফর্সা রঙের সঙ্গে খুব ভালো মানিয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। মাথা ভর্তি বড় বড় চুল। অনেকেই ওর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

আমাদের দেখে কমলজ্যোতি এগিয়ে এলো। থাবার মতন হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কি। সে-দিনের পর আর দেখাই নেই! কোথায় ছিলে ?

আমি বললাম, কলকাতা শহরেই।

কমলজ্যোতি বললো, কলকাতা শহরটা বড্ড ঘোরালো জায়গা। যখন যার সঙ্গে তোমার দেখা করতে ইচ্ছে হবে, কিছুতেই খুঁজে পাবে না। এত লোক অথচ প্রায় সবাই সবার অচেনা, এটা একটু আশ্চর্য না ?

কমলজ্যোতি কলকাতায় থেকেছে খুব কম দিনই। আমি বহু বছর কলকাতায় আছি বলে, এ সব কথা আমার মনে পড়ে না।

একজন বিলেত ফেরতের মুখে কলকাতা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রদীপের পছন্দ হয় না। সে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, তোর এই সার্টটা বিলিতি নারে ? দারুণ! ইউ লুক আউটস্ট্যাণ্ডিং।

কমলজ্যোতি বললো, তোর পছন্দ হয়েছে ? তুই নিবি।

—আমি আর একটু লম্বা হলে নিতাম।

কয়েকটি ভিখিরির ছেলে ঘিরে ধরেছে আমাদের। এখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। ভিখিরিরা কমলজ্যোতির

কাছেই পয়সা চাইছে সবাই। কমলজ্যোতি অন্যমনস্ক ভাবে প্যান্টের পকেট থেকে পয়সা বার করে দিয়ে দিচ্ছে এক একজনকে। কোনটা আধুলি বা কোনটা দশ পয়সা, তা তাকিয়েও দেখছে না। এ ব্যাপারে সাহেবদের মতই অভ্যেস করেছে কমলজ্যোতি। দৃশ্যটা আমার ভালো লাগে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাওয়া হবে?

কমলজ্যোতি বললো, বাগবাজার।

—সেখানে কি আছে?

—জানি না তো। আমি কখনও বাগবাজার দেখিনি, শুধু নামই শুনেছি। পুরোনো জায়গা, তাই না?

—কিন্তু এমনিতে সেখানে দেখবার তো কিছুই নেই?

—বাট আই ওয়াণ্ট টু গো।

প্রদীপ বললো, ঠিক আছে, বাগবাজারেই যাবো। কিন্তু তার আগে একটু গলা ভিজিয়ে গেলে হতো না।

কমলজ্যোতি বললো, ঠিক আছে, বাগবাজারের কোনো বারে গিয়ে বসলেই হবে। সেখানকার লোকজনের সঙ্গে আলাপ হবে।

প্রদীপ হেসে বললো, এ কি তুই বিলেত পেয়েছিস নাকি? বাগবাজারে কেনো বার নেই। কলকাতায় মদের দোকান খুব লোকালাইজড্। ড্রিংকিংটা এখানে অনেকটা ট্যাবু তো।

আমি কথা না বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলাম। অদ্ভুত ধরণের কথা বলছে এরা। এই বিকেলবেলা বাগবাজারের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করার কোন মানে হয়? আজকাল কমলজ্যোতি পারতপক্ষে ইংরেজি বলে না, আর প্রদীপ ক্রমশঃ যেন বাংলা ভুলেই যাচ্ছে। বিলেত না গিয়েও আদর্শ সাহেব।

কমলজ্যোতি বললো, তা হলে আগে বাগবাজার থেকেই ঘুরে আসি।

আমি কেটে পড়ার উদ্যোগ করতে লাগলাম। ব্যাপারটা হাস্যকর। বিনা কারণে বাগবাজার বেড়াতে যাওয়া! এ যেন কোন সাহেবকে নিয়ে শহর দেখানো।

কিন্তু ছাড়া পেলাম না। কমলজ্যোতি আমার হাত ধরে রইলো। প্রদীপ ট্যাক্সি ডাকলো।

আমি একসময় উত্তর কলকাতায় থাকতাম, ওসব দিকের রাস্তাঘাট সব আমার চেনা। এককালে বাগবাজারের রসগোল্লা আর গুণ্ডা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এখন রসগোল্লার বদলে আছে তেলেভাজা আর গুণ্ডাদের নতুন নাম হয়েছে মস্তান।

গিরিশ ঘোষের স্মৃতি ভবনের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এদিকে রাস্তা চওড়া হয়েছে, কিন্তু বাগবাজার স্ট্রীট সম্পূর্ণই খুঁড়ে রাখা। হাঁটা চলা করা শক্ত। তবু তারই মধ্যে অবিকল টুরিস্ট গাইডের ভঙ্গিতে প্রদীপ বলছে, এই দিকে যুগান্তর-এর অফিস, ঐ যে ঐটা বোসদের বিখ্যাত বাড়ি—আর এই দিকেই কোথায় যেন সিস্টার নিবেদিতা থাকতেন।

আমি কমলজ্যোতিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম লাগছে?

কমলজ্যোতি কি রকম একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। আমার কথার কোনো উত্তর দিল না।

এক এক সময় মানুষের মুখে তার বাল্যকালের ছায়া পড়ে। কমলজ্যোতিকে দেখে এখন আর মনে হয় না, সে একটি বিলেত ফেরৎ চৌকোশ যুবক। সে যেন ফিরে গেছে তার ছেলেবেলায়। আমরা যদি এখন হঠাৎ ওকে ছেড়ে চলে যাই, তা হলে ও পথ হারিয়ে ফেলবে। সেইজন্যই বোধহয় শক্ত করে আমার হাত ধরে আছে।

প্রদীপ বললে, এই এলাকাটার সঙ্গে বিলেতের কেনসিংটনের একটু মিল আছে না?

কমলজ্যোতি হঠাৎ বললো, এদিকে গোপীমোহন রায় লেন নামে কোনো রাস্তা আছে?

আমি বললাম, উ হুঃ। তবে গোপীমোহন দত্ত লেন নামে একটা রাস্তা আছে।

— সেখানে একবার যাবে ?

—কেন, সেখানে চেনা কেউ আছে ?

—না। এমনিই একবার যেতে চাই। শুধু দেখবো।

এসব কথার কোনো মানে বোঝা যায় না। ঐ রাস্তাটা কলকাতার আরেও হাজারটা রাস্তারই মতন। দেখবার কিছুই নেই। তবু যেতে হলো।

সেই রাস্তায় কমলজ্যোতি এসে প্রত্যেকটা বাড়ির দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগলো যেন এরা তার খুব চেনা। তিনটি কিশোরী মেয়ে একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কমলজ্যোতির চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে বারবার তাকাতে লাগলো ফিরে ফিরে।

মেয়ে তিনটি আমাকে ও প্রদীপকে অগ্রাহ্য করে শুধু কমলজ্যোতিকেই দেখছে—এজন্য আমাদের খানিকটা ঈর্ষা হলেও হতে পারতো। কিন্তু কি আর করা যাবে কমলজ্যোতির চেহারাটা সত্যিই তাকিয়ে দেখার মতন। বিলেতে থেকে থেকে গায়ের রংটা একেবারে সাহেবদের মতন করে ফেলেছে। এ দেশে ফর্সা রঙের বড় কদর। এমন কি ছেলেদেরও।

প্রদীপ জিজ্ঞেস করলো, কি রে, তুই এই রাস্তায় কারুকে চিনিস কিনা বল না ?

কমলজ্যোতি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, না তবে, আমার বাবা এখানেই একটা বাড়িতে জন্মে ছিলেন।

—কোন বাড়ি ? কত নম্বর ?

—কিছু মনে নেই। শুধু রাস্তার নামটা একটু একটু মনে ছিল, কারণ আমার বাবার লেখা কয়েকখানা চিঠি আমার মায়ের জিনিসপত্রের মধ্যে দেখেছিলাম এক সময়।

—তোর বাবার নাম বললে নিশ্চয়ই এ পাড়ার অনেকে চিনবে। বাড়িটা খুঁজে বার করা শক্ত কিছু না; তোর বাবার নাম কি ছিল যেন ?

—ধীরেন চ্যাটার্জি। কিন্তু লোককে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। আমার বাবা মারা গেছেন যোলো বছর আগে। এখানকার বাড়িও বিক্রি হয়ে গেছে অনেকদিন।

প্রদীপ জিজ্ঞেস করলো, তুই কি এখানে জন্মেছিস ?

কমলজ্যোতি বললো, না, আমার জন্মস্থান পি. জি. হাসপাতাল। আমি আমার বাবার বাড়িতে কখনো থাকিনি। এমনকি, আমি আমার বাবাকে কখনো চোখেই দেখিনি।

—তার মানে ?

—হয়তো আমার এক বছর দু' বছর বয়েসে দেখে থাকতেও পারি, কিন্তু সেটা আমার মনে থাকবার কথা নয়। মোট কথা, আমার যখন দেড় বছর বয়েস, তখনই আমার মায়ের সঙ্গে আমার বাবার ঝগড়া শুরু হয়। আমার জন্মের পর আমি ছিলাম মামার বাড়িতে। আমার মায়ের সঙ্গে আমার বাবার যখন বিচ্ছেদ হয়, তখন আমার বয়েস সাড়ে চার বছর। বাবা আমাকে চেয়েছিলেন, মা কিছুতেই দেন নি। একটা জেদাজেদির ব্যাপার ছিল। শেষ পর্যন্ত, বাবা রাগ করে আমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখলেন না। কোনোদিন আমাকে আর দেখতেও চান নি। মরার আগে শুধু আমার জন্য কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবু বুঝি তোমার পৈতৃক বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল ?

কমলজ্যোতি বললো, গতকাল আমি পি. জি হাসপাতালটা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার জন্মস্থান। কিন্তু যাই বলো, হাসপাতালটাকে কিছুতেই জন্মস্থান হিসেবে ভাবা যায় না। খালি মনে হচ্ছে, আমার একটা কিছু ফিরে পাওয়া দরকার। খুব ছেলেবেলায় এখানেই তো—

প্রদীপ বললেন, বাড়িটা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না। তোর যখন এতই দেখতে ইচ্ছে করছে।

কমলজ্যোতি হেসে বললো কোন্ বাড়িটা জানি না। তা ছাড়া, সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। সুতরাং সেটাকে পৈতৃক বাড়িও আর বলা যায় না। তবু, আমার বাবা এই রাস্তায় থাকতেন, এখানে হাঁটা-চলা করতেন, সেটা একটু ফিল করতে এসেছিলাম আর কি! তোমাদের কাছে কি ব্যাপারটা খুব মজার লাগছে?

প্রদীপ বললো, মজার ঠিক নয়—তবে বড্ড সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার।

আমি বললাম, তুমি যে-রকম সমাজের কথা বলছো, সে রকম সমাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই।

কমলজ্যোতি বললো, তাহলে আর একটা মজার ব্যাপার শোনো। আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি, তিনি আমার খোঁজ খবর করেননি কখনো, তবু আমাকে সেই বাবার পদবী রাখতে হয়। পাশপোর্ট কিংবা নানা রকম ফর্মে লিখতে হয় বাবার নাম। তাছাড়া, তোমাদের সকলেরই কাকা-জ্যাঠা বা ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, পিসী, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোন—এইসব আছে। থাকে না? আমার কিন্তু ওসব কিছু নেই। আমার মা আরও দু'বার বিয়ে করেছিলেন, তাদের কারুকেই কিন্তু আমি বাবা বলতে পরিনি। তারা দু'জনেই আবার বাচ্চা-টাচ্চা পছন্দ করতেন না বলে আমি চিরকাল থেকেছি হস্টেলে।

প্রদীপ জিজ্ঞেস করলো, কেন, মামার বাড়ি?

—সেখানেও যাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে মহিলা তিনবার বিয়ে করেন, তার কি বাপের বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে? তোমাদের এই অর্থোডক্স হিন্দু সমাজে মায়ের কোন স্থান ছিল না।

প্রদীপ বললো, স্বাভাবিক!

আমি মনে মনে কমলজ্যোতির মায়ের চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। প্রায় তিরিশ বছর আগে একজন হিন্দু মহিলা

স্বামী পরিত্যাগ করে আবার বিয়ে করেছিলেন। একবার নয়, তিনবার। যেন হলিউডের অ্যাকট্রেস। অন্য কারুর মুখে এই মহিলার কাহিনী শুনলে মনে হতো, নিশ্চয়ই একটি দুশ্চরিত্রা কিংবা লালসাময়ী নারী। কিন্তু কমলজ্যোতিকে দেখলে তার মা সম্পর্কে একথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। এটা আমাদের এক ধরণের সংস্কার। বরং ওর মায়ের জন্য একটু দুঃখ হয়।

কমলজ্যোতি বললো, আমার নিজের সম্পর্কে আমি বড্ড বেশী কথা বলছি। তোমাদের খুব বোরিং লাগছে নিশ্চয়ই!

প্রদীপ বললো, না, তা নয় ঠিক। তবে বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে।

আমি বললাম, তোমার ব্যাপারটা প্রায় গল্পের মতন। বলো, বলো, শুনি।

কমলজ্যোতি বললো, আর একটুখানি আমার বলা উচিত। আমার মা সম্পর্কে তোমরা কি মনে করছো, জানি না। মা তিনবার বিয়ে করেছিলেন। একটা বিয়েও সুখের হয়নি। এ ছাড়াও অন্য কারুর কারুর সঙ্গে আমার মায়ের নাম জড়িয়ে অনেক রকম কথা শোনা যেত। মা কি চাইতেন কিংবা কেন সুখী হতেন না, আমি জানি না। কিন্তু মায়ের মনটা ছিল ভীষণ স্নেহে ভরা। হস্টেলে থাকবার সময় আমার কখনো সামান্য একটু অসুখ করলেও মা প্লেন ভাড়া করে চলে আসতেন আর ভীষণ কান্নাকাটি করতেন। মা মারা যাবার পর আমি এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা হয়ে যাই। আমার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই!

প্রদীপ বললো, দার্জিলিং-এর স্কুল থেকে তুই লণ্ডনে চলে গিয়েছিলি কত বছর বয়েসে?

—তখন আমার বয়েস আঠেরো। সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেই।

—তাহলে তোর তো বিলেতেই থেকে যাওয়া উচিত ছিল। তুই এ দেশে ফিরে এলি কেন? এ দেশের সঙ্গে তো তোর কোনো যোগই নেই।

—তা ঠিক।

—বিলেত ছেড়ে এই পচা দেশে কেউ আসে? তোর ওখানে ভালো চাকরি-বাকরি ছিল—

—তবু কেন এলাম জানিস? একজন আমাকে অপমান করেছিল বলে।

—কে?

—সে আছে একজন!

॥ ৫ ॥

কমলজ্যোতির ফ্ল্যাটে প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলাই আড্ডা জমে। সে টাকা পয়সা খরচ করছে দু' হাতে। তাছাড়া, ওর খুব গান বাজনার ঝোঁক। গান বাজনার নামে খুব চ্যাঁচামেচি হয়, সেই সঙ্গে মদের ফোয়ারা বইতে থাকে। ওর বাবুর্চি মাংসও রাঁধে খুব ভালো।

কমলজ্যোতির গান বাজনার প্রতি আকর্ষণটাও একটু অস্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে ওর যোগ নেই। বাংলা সাহিত্যের কোনো খবরই রাখে না। প্রথম দিন আলাপ হবার পর, কমলজ্যোতি লেখক হিসেবে আমার নাম কখনো শোনেনি বলায় আমি মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম, কমলজ্যোতি শরৎচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের একটি বইও পড়েনি। ও শুধু জানে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

বাংলা ভাষাটা ও বলতেও প্রায় ভুলে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য খুব অল্পদিনেই ঝালিয়ে নিয়েছে। এখন নির্ভুল বাংলা বলে। মাতৃভাষাটা বোধহয় মনের কোনো একটা স্তরে থেকেই যায়, মানুষ কখনো পুরোপুরি ভুলতে পারে না। সত্যি যদি কেউ ইচ্ছে করে ভুলে যাবার চেষ্টা করে, সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। সে রকম লোকও আমি দেখেছি।

সুতরাং বাংলা গানের সম্পর্কেও কমলজ্যোতির কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। ওর নিজের গানের গলা নেই। তবে, ওর মা নাচতেন এবং গান করতেন—অনেককাল আগেকার কিছু বাংলা ও হিন্দী ছবিতে নেমেছিলেন—সে সব ফিল্মের কেউ নামও জানে না আজকাল।

তবু, কমলজ্যোতির রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি একটু অদ্ভুত ভালোবাসা আমি লক্ষ্য করেছি। অখণ্ড গীতবিতান নিয়েও গান মুখস্ত করে। ওর বন্ধুরা কিছু কিছু খ্যাত অখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক গায়িকাকে নিয়ে যায়, কমলজ্যোতি বিভোর হয়ে শোনে। কখনো কখনো নিজের গলা মেলায়। ওর গলার সুর কম এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধরণটা ওর একেবারেই আসে না।

মানুষের চরিত্রে একটা না একটা রহস্যময় দিক থাকেই। কমলজ্যোতির এই রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রীতিটাই রহস্য।

আমি একদিন নিরালায় ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলাম, তুমি কেন এই রকম পাগলামি করছো? রবীন্দ্র সঙ্গীত তোমার জন্য নয়।

কমলজ্যোতি চটে গিয়ে বললো, কেন, আমার জন্য নয় কেন? রবীন্দ্রনাথকে তো তোমরা বলো বিশ্বকবি—

--গান জিনিসটা সকলের জন্য না ভাই!

—চেষ্টা করলেও আমি পারবো না? চেষ্টা করলে সব কিছুই পারা যায়।

—তোমাকে তাহলে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। অনেক দিনের ব্যাপার।

—যতদিনই লাগুক। আমি ছাড়বো না। গান যদি শিখতে নাও পারি, অন্তত সমঝদার হতে পারবো তো।

—রবীন্দ্র সঙ্গীতের সমঝদার হতে হলে তোমাকে শুধু গান শুনলেই চলবে না। তোমাকে রবীন্দ্রনাথের লেখাও পড়তে হবে ভালোভাবে।

এবার কমলজ্যোতি একটু করুণ ভাবে বললো, ভাই, বাংলা বই পড়তে আমার বড্ড সময় লাগে। এক একটা বই নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি, কয়েক পাতা পড়ার পরই সব গুলিয়ে যায়।

—কিন্তু গান শেখার চেয়ে বই পড়তে শেখা অনেক সহজ।

পরের দিন গিয়েই দেখলাম কমলজ্যোতি সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী কিনে ফেলেছে। বিশ্বভারতী সংস্করণ, দারুণ দামী। একখানা বইই যে এখন পড়ে শেষ করতে পারে না, তার যে একসঙ্গে অত বই কেনার দরকার ছিল না, এ কথা কে বোঝাবে ওকে? ওর টাকা আছে, খরচ করবেই ঠিক করেছে।

দু'দিনেই অবশ্য গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। বন্ধু বান্ধবের অনেকেরই মনে পড়ে গেল কোন্ কোন্ খণ্ডটা যেন তাদের পড়া বাকি আছে। সুতরাং তারা দু'একদিনের জন্য ধার নিয়ে গেল। আমি জানি, ঐ বইগুলো আর ফিরবে না কোনদিনই। এই রকমই নিয়ম।

আমি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করিনি। শুভব্রতর বোন মল্লিকা শুধু বললো, এ কি, আপনি এত দামী বইগুলো এমনি এমনি দিয়ে দিলেন।

মল্লিকা প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলাতেই আসে। সে আজকাল কমলজ্যোতিকে গান শেখাচ্ছে। তা ছাড়া, মল্লিকার ইচ্ছে সবাই মিলে একটা থিয়েটার করা। এই ফ্ল্যাটেই চমৎকার রিহার্সাল দেওয়া যাবে। কমলজ্যোতির ফ্ল্যাটটা মধ্য কলকাতায়, অধিবাসীরা নানা প্রদেশের—সুতরাং যতই চ্যাঁচামেচি হোক, কেউ মাথা ঘামায় না। এখনো নাটক ঠিক হয় নি, শুধু বাছাবাছি চলছে।

মল্লিকাব কথা শুনে কমলজ্যোতি বললো, তাতে কি হয়েছে?

—না, না, কাকে কোন্ বইটা দিচ্ছেন, নাম লিখে রাখুন।

—তার কি দরকার আছে?

—নিশ্চয়ই দরকার আছে।

মল্লিকা নিজেই সে ভার নিয়ে নিল। কমলজ্যোতি আপত্তি করলো না।

আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, কমলজ্যোতির ব্যবহার বা কথাবার্তা কখনো একটু রুক্ষ হলেও, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার সব সময়েই সম্ভ্রমপূর্ণ। মেয়েদের আড়ালেও সে তাদের সম্পর্কে একটাও খারাপ কথা বলে না।

কমলজ্যোতির চেহারা সুন্দর, পোশাক ঝলমলে, হাতে প্রচুর টাকা, গায়ে বিলিতি পালিশ এবং অবিবাহিত—সুতরাং তার সম্পর্কে মেয়েদের আগ্রহ থাকবেই। পাঁচ ছ' জন মেয়ে এখানে প্রায় নিয়মিত আসে। অবশ্য মল্লিকা আর কোন মেয়েকে কমলজ্যোতির বেশী কাছে ঘেঁসতে দেয় না। মল্লিকার ভাব ভঙ্গি এর মধ্যে অনেকটা কমলজ্যোতির অভিভাবকের মতন।

একদিন রাত দশটার সময় আমি আর প্রদীপ কমলজ্যোতির ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখলাম, মল্লিকা তখনও সেখানে রয়েছে। আর কেউ নেই।

ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে বসবার ঘরে একটা সোফায় কমলজ্যোতি অপরাধীর মতন মুখ করে বসে আছে, একটু দূরে অন্য সোফায় বসে মল্লিকা কি যেন বলছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল।

কমলজ্যোতির ফ্ল্যাটে এত হৈ হল্লা হলেও মেয়েদের নিয়ে কোন রকম বেলেল্লাপনা দেখিনি। সেদিকে কমলজ্যোতির ঝোঁক নেই মনে হয়। বিলেতে সে এক ধরণের সংস্কৃতিহীন জীবন কাটাতো। এখানে সে কোন একটা সংস্কৃতি খুঁজতে এসেছে। তার মতন একজন যুবকের পক্ষে শুধুই সংস্কৃতি খোঁজা বেশ অস্বাভাবিক হলেও সেটাই সে চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে এত রাত্রে একলা এখানে মল্লিকা বসে থাকায় দৃশ্যটা ঠিক যেন মেলে না।

ঘরের চার পাঁচটা অ্যাশট্রে সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি। কিছু পড়ে আছে বাইরে। অনেকগুলো খালি গেলাস এখানে সেখানে

ছড়ানো। দুটো বোতলের মধ্যে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি আর ধোঁয়া।

এই অবস্থায় এসে পড়ে, আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। ওরা নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তিগত কথা বলছিল। প্রদীপই আমাকে জোর করে টেনে এনেছে।

কমলজ্যোতিকে দেখে অবশ্য মনে হলো, আমরা আসাতে সে খুশীই হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, এসো, এসো।

মল্লিকার মুখে খানিকটা রাগের ভাব ফুটে উঠলো। সে আমাদের দিকে তাকালোই না।

প্রদীপ জিজ্ঞেস করলো, মল্লিকা, তুমি এখনো যাও নি? তোমাকে তো সেই অনেক দূরে যেতে হবে।

মল্লিকা বললো, ওর সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

মল্লিকার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলাম, মল্লিকা নিশ্চয়ই সাধারণ কোনো দরকারের কথা বলছে না। নাটক ফাটকের ব্যাপার নয়। যে সমস্ত ব্যাপারকে মেয়েরা জীবন মরণের প্রশ্ন মনে করে, বোধ হয় সে রকম কিছু।

কোনো অবিবাহিত পুরুষের ঘরে একা কোনো মেয়েকে রাত দশটায় বসে থাকতে দেখা আমাদের ঠিক পছন্দ হয় না। বিশেষত মেয়েটি যখন চেনা, আমাদেরই কোন বন্ধুর বোন। আমাদের মনের ভেতরকার নীতি-বাগীশ হঠাৎ এই সময় উঁকি মারে।

কিংবা, এটা ঈর্ষাও হতে পারে। আমি যদি এই অবস্থায় থাকতুম, এবং মল্লিকার মতন মোটামুটি সুন্দরী এবং রুচিশীলা একটি মেয়ে আমার সঙ্গে এই সময়ে দেখা করতে আসতো, আমি নিশ্চয়ই খুশী হতাম। অন্যের ব্যাপার দেখেই পছন্দ করতে পারছি না। এই প্রথম আমি অনুভব করলুম, কমলজ্যোতিকে আমি একটু একটু ঈর্ষা করি। সে আমার তুলনায় অনেক কিছুই বেশী বেশী পেতে পারে।

প্রদীপ বললো, মল্লিকা, তুমি এবার যাও।

প্রদীপ কথাটা এমন কঠোর ভাবে বললো যে, আমিও চমকে উঠলাম। প্রদীপ যেন জ্যাঠামশাই।

মল্লিকা উদ্ধতভাবে বললো, ওর সঙ্গে আমার কথা এখনো শেষ হয়নি!

প্রদীপ একই সুরে বললো, আজ আর কথার দরকার নেই কাল আবার বলো। অনেক রাত হয়ে গেছে।

—তুমি আমার গার্জেন হলে কবে থেকে?

—মল্লিকা, রাত দশটা বেজে গেছে।

—আমি জানি আমার হাতেই ঘড়ি আছে।

কমলজ্যোতি অপ্রস্তুত বোধ করছে। সে-ই একটা উপায় বার করলো।

কমলজ্যোতি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি আজ সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোইনি, চলো, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ওকেও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসা হবে।

মল্লিকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো। জ্বলন্ত চোখে তাকালো প্রদীপের দিকে।

বাইরে বৃষ্টি-শেষের ঠাণ্ডা হাওয়া। আমরা হাঁটতে লাগলাম কিছুক্ষণ নিঃশব্দে। মল্লিকা একেবারে গুম হয়ে গেছে। আমি অস্বস্তি কাটাবার জন্য কমলজ্যোতিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি তাহলে কলকাতাতেই পরোপুরি থেকে যাবে ঠিক করলে?

কমলজ্যোতি বললো, কিছুই ঠিক করিনি।

—কলকাতা ভালো লাগছে।

—কলকাতায় কি ভালো লাগবার মতন কিছু আছে।

আমি উত্তর দেবার আগেই লণ্ডন-প্রেমিক প্রদীপ বললো, বিলেতে অতদিন থাকবার পর কলকাতা কারুরই ভালো লাগতে পারে না। যদি না বিশেষ কোন অ্যাট্রাকশান থাকে।

আমি বললাম, কমলজ্যোতির তো অ্যাট্রাকশান আছেই! রবীন্দ্র সঙ্গীত।

প্রদীপ বললো, লণ্ডনে বসে বুঝি রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা যায় না? রেকর্ড তো আনানোই যায়, তাছাড়া বাঙ্গালীদের অনেক রকম ফাংশান হয়—

আমি কমলজ্যোতিকে বললাম, ভাই, তুমি এখানে যতদিন খুশী থাকো, কিন্তু প্রদীপকে একটু ওদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও। ওর আর মন এখানে টিঁকছে না।

প্রদীপ বললো, আমিতো যাবোই।

মল্লিকার বাস এসে গেছে। সে কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে সোজা এগিয়ে বাসে উঠে পড়লো। বাসে বেশী ভিড় নেই। আমরা দেখলাম, মল্লিকা জায়গা পেয়েছে জানলার ধারে। সেখান থেকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কমলজ্যোতির দিকে। সে দৃষ্টির মধ্যে রাজ্যের তৃষ্ণা।

আমার মনে হলো মল্লিকা আজ বাড়ি ফিরে নিশ্চয়ই কাঁদবে। যে-কথা মেয়েরা অন্য একজনকে বলতে চেয়েও বলতে পারে না, সে কথা, নির্জনে শুয়ে শুয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে নিজের বালিশকে বলে।

বাসটা ছেড়ে যাওয়ার পর প্রদীপ কমলজ্যোতিকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার?

কমলজ্যোতি হাসলো।

আমি বললাম, ব্যাপার তো বোঝাই যাচ্ছে, এর আর জিজ্ঞেস করার কি আছে?

প্রদীপ বললো, তবু শুনি।

কমলজ্যোতি বললো, তোমরা এসে পড়ে খুব ভালো করেছো! আমি, মানে, ঠিক কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না!

—কি চায় মল্লিকা? প্রেম না শারীরিক কিছু?

আমি প্রদীপকে বাধা দিয়ে বললাম, দেখ, মল্লিকা সম্পর্কে এরকম কথা বলিস না। ও ঠিক সাধারণ কোনো মেয়ে নয়। ওর একটা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে।

প্রদীপ আমাকে এক ধমক দিয়ে বললো, তুই চুপ কর। তুই মল্লিকা সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জানিস?

তখন আমার মনে পড়লো, মল্লিকার সঙ্গে প্রদীপের খুব ছেলেবেলা থেকেই পরিচয়। এক সময় একটা কিছু হৃদয় ঘটিত ব্যাপার হয়েছিল। তারপর প্রদীপের উড়নচণ্ডী স্বভাবের জন্যই বোধহয় ওদের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব এসে যায় আবার।

নিজের প্রাক্তন প্রেমিকাকে আর একজন বন্ধুর সঙ্গে নিরালা ঘরে বেশী রাত্রে দেখতে পেলে কেমন লাগে, আমি তা জানি না। প্রদীপকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। কমলজ্যোতির উপরেও কি খুব রেগে গেছে প্রদীপ? এই জন্যই ও মল্লিকাকে ওরকম আদেশ দিয়ে বলেছিল, বাড়ি যাও!

কমলজ্যোতি বললো, মল্লিকা আমার ফ্ল্যাটে এসে থাকতে চায়। ওর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না। ও চায় পুরোপুরি শিল্পী হতে—কিন্তু ওর বাড়িতে সেই পরিবেশ নেই।

প্রদীপ একটু ব্যঙ্গের সুরে বললো, তুই রাজি হলেই পারতি! আমরা কেউ কিছু মনে করতাম না!

আমিও প্রদীপকে একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, বিলেত টিলেতে তো এইরকম অনেকেই থাকে, তাই না?

বলে ফেলেই আমার অনুতাপ হলো। বেশী কঠিন হয়ে গেছে।

প্রদীপ উদাসী হয়ে গিয়ে বললো, মল্লিকা এই রকম কিছু চায়, আমি জানতাম। সাধারণ সাংসারিক জীবন ওর পছন্দ নয়। কিন্তু ও কি বিয়ে না করেই তোর ফ্ল্যাটে থাকতে চেয়েছিল?

—বিয়ের কথাটাই ওঠে নি।

একটু থেমে কমলজ্যোতি বললো, বছর দু'এক আগে আমি নিজেই নানান মেয়ের পেছনে ঘুরে বেড়াতাম।

—মেম সাহেব?

—অনেক সময়। বিলেতে বাঙালী মেয়েরও অভাব নেই। আমি বেশ উচ্ছৃঙ্খল ধরণের ছিলাম। কিন্তু কোনদিন কোন মেয়ে নিজে থেকে আমাকে এ রকম কিছু বলেনি। তাই আমি জানি না, তাদের মনে আঘাত না দিয়ে কি ভাবে এখানে কথা বলতে হয়।

—তুমি কি বলেছিলে ওকে?

—আমি বলেছিলাম, মল্লিকা, তুমি এই ফ্ল্যাটে থাকতে পারো কোনো অসুবিধে নেই, আমি অন্য একটা জায়গা খুঁজে নেবো। মল্লিকা সে কথা শুনে খুশী হয়নি।

—খুশী না হবারই কথা। মল্লিকা তো শুধু একটা ঘর চায় নি! এ কথা শুনে ও কি বললো?

আমি প্রদীপকে বাধা দিয়ে বললাম, ছাখ, এটা মল্লিকার অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা নিয়ে আমাদের এ রকম ভাবে আলোচনা করাটা ঠিক ভদ্রতা নয়।

প্রদীপ হিংস্র ভাবে আমাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বললো, তুই চুপ করতো! তুই বড্ড বেশী সেন্টিমেন্টাল।

কমলজ্যোতি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি ভুল কিছু বলেছি?

—না। খাঁটি জেন্টলম্যানের মতনই উত্তর দিয়েছো।

প্রদীপ বললো, জেন্টলম্যানদের পছন্দ করে অন্য জেন্টলম্যানরা কিন্তু মেয়েরা চায় প্রেমিক। আর সেই প্রেমিক একটা বর্বর হলেও ক্ষতি নেই—বিশেষত নির্জনে ঘরের মধ্যে—

আমি একটু হাসতেই প্রদীপ আমাকে ধমক দিয়ে থামালো।

কমলজ্যোতির দিকে ফিরে বললো, তুই এত বোকা কেন? তোর রাজি হওয়া উচিত ছিল। একটা মেয়ে যখন নিজে থেকেই

চাইছে, তখন তাকে নিয়ে ফুর্তি করার সুযোগ নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

কমলজ্যোতি ম্লান ভাবে বললো, এ রকম ভাবে কোনো মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করার মতন মন আমার আর নেই। বোধহয় ক্ষমতাও নেই। এক সময় ছিল। এখন আমি জানি, ভালোবাসা ছাড়া আর কোন কিছুরই মূল্য নেই।

প্রদীপ হো হো করে হেসে উঠে বললো, ভালোবাসা? সে আবার কি! এ তো একটা বস্তা পচা কথা।

—এক সময়ে আমিও তাই ভাবতাম।

—মল্লিকাকে তোর পছন্দ হয় কি? ওরকম ভালো স্বাস্থ্য।

—পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। কিন্তু নতুন কোনো মেয়েকে আমার পক্ষে আর ভালোবাসা বোধহয় সম্ভব নয়।

—মার গুলি ভালোবাসায়। একটা মেয়ে নিজে থেকে শুতে চাইলে তোর সঙ্গে।

রাত ঘন হয়ে এসেছে। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া কম। হাওয়া দিচ্ছে চমৎকার। এই সময় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রদীপ আর কমলজ্যোতি ভালোবাসা নিয়ে খুব একটা তর্কে মেতে উঠলো। আমি সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। ভালোবাসার কথা উঠলে সকলেরই নিজের জীবনের কোনো ঘটনা মনে পড়ে যায়।

॥ ৬ ॥

মাস তিনেকের মধ্যেই কমলজ্যোতির সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের কাছে। পুরুষ মানুষের রহস্য আর কতদিন থাকবে!

কমলজ্যোতির ফ্ল্যাটে সেই রকম হৈ হল্লা আর নেই। অনেকেই আর যায় না। কমলজ্যোতির পয়সাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে, বিলেতেও আর ফিরে যাবে না।

কমলজ্যোতির জন্য এখন মায়া হয়। ছেলেটা নিজের বাবাকে চোখে দেখেনি, মাকেও বেশী কাছে পায়নি—সারা জীবন স্নেহ-বঞ্চিত। ওর পক্ষে উচিত ছিল জীবনটাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করা। কিংবা কোন নারীর নিবীড় ভালোবাসা পেলে হয়তো বেঁচে যেত।

বিলেতে থাকার সময় ও অনেক নারীসঙ্গ পেয়েছিল, কিন্তু ভালোবাসা পায় নি। কিংবা ভালোবাসা খোঁজেও নি। হঠাৎ ওর সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে গেল মায়া রায়কে দেখে।

মায়া রায় বিলেতে ছিল মাত্র দেড় বছর। গিয়েছিল লাইব্রেরিয়ানশীপের একটা ট্রেনিং নিতে। কমলজ্যোতি সব মিলিয়ে ওকে দেখেছে মাত্র সাত আটবার।

কমলজ্যোতি একদিন ওর পকেট থেকে মায়া রায়ের ছবি বার করে আমাকে দেখিয়ে বললো, তুমি এর চেয়ে বেশী সুন্দরী আর কোন মেয়েকে দেখেছ?

মায়া রায়ের ছবিটা 'বেতার জগৎ' পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া। মায়া রায়ের চেহেরার একটা আকর্ষণ থাকলেও আর যাই হোক, তাকে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলা যায় না।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, মেম সাহেবদের থেকেও বেশী সুন্দরী?

কমলজ্যোতির ঠাট্টা ইয়ারকির দিকে মন নেই। গম্ভীরভাবে বললো, মেমসাহেবরা আবার সুন্দর হয় নাকি? তুমি কি বলছো কি?

—মায়া রায়ের কপালটা ছোট।

—চুপ!

কমলজ্যোতি বাক্সটি খুলে আর একটা ছবি বার করলো। অনেক পুরানো ছবি। খুব সাজগোজ করা একজন মধ্য বয়েসী মহিলা। আগের দিনের ফ্যাসন অনুযায়ী পাতা কেটে চুল আঁচড়ানো, কপালে টিপ, কানে দুটি বড় সাইজের কানবালা।

কমলজ্যোতি বললো, আর এই ছবিটা দ্যাখো। খুব মিল আছে না দু'জনের মধ্যে।

আমার বুদ্ধি খুব একটা তীক্ষ্ণ না হলেও বুঝতে অসুবিধা হলো না যে দ্বিতীয় ছবিটি কমলজ্যোতির মায়ের। মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত এই যুবক অন্য একটি নারীর মধ্যে তার মায়ের রূপ খুঁজে পেয়েছে।

কমলজ্যোতি বললো, মায়া রায়কে যেদিন আমি প্রথম দেখি, দারুণ চমকে উঠলাম। ঠোঁটের চাপা হাসিটা দেখেই মনে হয়েছিল, এ তো আমার দারুণ চেনা। কোথায় যেন দেখেছি। তখন মনে পড়লো আমার মায়ের কথা।

—মায়া রায়কে এ কথা বলেছিলে?

—যাঃ তা কখনো বলা যায়?

—মায়া রায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল?

—খুব বেশী নয়। উনি লোকজনের সঙ্গে খুব বেশী মিশতে পারেন না।

—তবু শুধু ওর জন্য তুমি সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে এদেশে চলে এলে?

—শুধু ওর জন্য ঠিক নয়। মায়া রায় আমার মনের মধ্যে নিজের দেশের কথা জাগিয়ে দিলেন। তা ছাড়া, উনি আমাকে অপমান করেছিলেন কিনা!

—মায়া রায় সম্পর্কে আমি যেটুকু শুনেছি, কারুকে অপমান করার মতন মেয়ে তো নয়!

—দোষটা আমার ছিল। লণ্ডনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটা পার্টি হচ্ছিল। মায়া রায় গান গাইছিলেন। আমি তখন রবীন্দ্র সঙ্গীতের কিছুই জানি না। বাংলা গানই শুনি না। তাছাড়া সেদিন আমি একটু বেশী ড্রীঙ্ক করেছিলাম। মায়া রায় গাইছিলেন 'হৃদয় নন্দন বনে'—আমি তার মধ্যে জোরে জোরে কথা বলছিলাম একজনের সঙ্গে। তার মধ্যে দু' একটা এমন শব্দ, শ্ল্যাং যাকে বলে, তাও ছিল বোধহয়। বুঝলে না, ঘোরের মাথায়···তখন ওর গানটাও মনে হচ্ছিল প্যানপ্যানানি। মায়া রায় হঠাৎ গান বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। গীত-বিতান হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর

থেকে। অনেকে অনেক অনুরোধ করলো, কিছুতেই আর গান গাইলেন না। ততক্ষণে আমারও খেয়াল হয়েছে। আমি এরকম অভদ্র নই। তবু সেদিন কি রকম গণ্ডগোল করে ফেলেছিলাম। ঘরের অন্য সব লোক চুপ করে আছে। অনেকেই ভৎর্সনার চোখে তাকালো আমার দিকে। উনি যখন চলে যাচ্ছেন, আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, মিস রায়, প্লিজ এক্সকিউজ মী—। মায়া রায় আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখ মেলে তাকালেন। আমি অনেক অনুরোধ করলাম। উনি শুধু বললেন আমার মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। হঠাৎ আমার মনে হলো, ঠিক যেন আমার মা আমাকে বকছেন। সারারাত ঘুমোতে পারি নি।

—সেই কি শেষ দেখা ?

—না। তারপরও আমি অনেক দূর গিয়েছিলাম। মায়া রায়কে বিয়ে পর্যন্ত করতে চেয়েছিলাম। উনি আর আমার সঙ্গে কথা বলতেই রাজি হননি। আমার সবটাই ভুল হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কমলজ্যোতি, তুমি জানো নিশ্চয়ই, রেডিওতে বা রেকর্ডে মায়া রায়ের নাম এখনো না বদলালেও উনি কিন্তু আসলে এখন মায়া সেনগুপ্তা।

—জানি।

—কলকাতায় এসে ওঁকে আর দেখেছো ?

—প্রত্যেকটি গানের জলসায় গেছি। কিন্তু আমি বোধহয় জীবনে ওঁর ক্ষমা পাবো না।

॥ ৭ ॥

আমি নিজেই আর একদিন কমলজ্যোতির ফ্ল্যাটে গেলাম। রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে ও বললো, খোলা আছে, ঠেলুন!

দরজা খুলে দেখি ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ আর কমলজ্যোতি বসে আছে।

—এ কি, আলো জ্বালো নি কেন?

প্রদীপ বললো, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে এখানে বোস। অন্ধকারে তোর অসুবিধে হচ্ছে? দাঁড়া, মোমবাতিটা জ্বালাচ্ছি। শালা, মোমবাতিটা বারবার নিভে যাচ্ছে হাওয়ায়—

—কেন, ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে না? ফিউজ তো হয়নি, বাইরে আলো জ্বলছে দেখলাম!

প্রদীপ খস্ করে দেশালাই জ্বেলে মোমবাতি ধরালো। হাওয়ায় সেটা কাঁপছে। কমলজ্যোতি বললো, আলো আর জ্বলবে না। বাড়িওয়ালা লাইন কেটে দিয়ে গেছে।

—এখনো ভাড়া দাওনি? তোমার বাবার সেই সাকসেশান সার্টিফিকেট হয় নি এখনও?

কমলজ্যোতি একটু ঘোর লাগা গলায় হা হা করে হাসলো। তারপর বললো, তোমাকে সেদিন তোমার বান্ধবীর সামনে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আসলে আমার বাবার ব্যাঙ্কে কোনোই টাকা ছিল না। মাই ফাদার ডায়েড আ পপার!

প্রদীপ বললো, সুনীলটা যা শোনে সবই বিশ্বাস করে। বেশ গালিবল টাইপ! নে খা—

বোতল থেকে গেলাসে ঢেলে প্রদীপ আমার দিকে গেলাসটা বাড়িয়ে দিল। এক চুমুক দিয়েই আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি রে! এটা কি খাচ্ছিস!

—কেন, খারাপ লাগছে ?

—জিনিসটা কি বলতো ? কি রকম যেন একটা স্বাদ

—বাংলা। কেন তোর চলবে না? কবে থেকে বুর্জোয়া হলি ?

—সে কথা হচ্ছে না। প্রদীপ, তুই কমলজ্যোতিকেও বাংলা ধরিয়ে দিলি? বেচারা এত সাহেব ছিল আগে তার থেকে কোথায় পতন হলো !

—আমি মোটেই ধরাইনি। কমলজ্যোতির সব টাকা-কড়ি ফুরিয়ে গেছে। আমি এসে দেখি মুখ চুন করে বসে আছে। তাই আমি ভাবলাম, ও আমাদের এত খাইয়েছে, আজ আমাদেরই খাওয়ানো উচিত। আমার ভাই বিলাইতি খাওয়াবার পয়সা নেই, তাই দু'বোতল বাংলা নিয়ে এলাম।

কমলজ্যোতি উৎসাহের সঙ্গে বললো, কোন চিন্তা নেই, শিগগিরই টাকা পেয়ে যাচ্ছি। আমার বাড়িওয়ালা আমাকে অফার দিয়েছে, আমাকে বাকি ভাড়া দিতে হবে না—আমি যদি এখন উঠে যাই, তাহলে আমাকেই ও তিন হাজার টাকা দেবে। ভাবছি সেটাই নিয়ে নেবো।

—তারপর সে টাকায় কতদিন চলবে ? অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হলে তো টাকা দিতে হবে।

—যতদিন চলে চলুক না !

—কমলজ্যোতি, শুধু শুধু এভাবে দিনগুলো নষ্ট করছো কেন ? বিলেতে তোমার একটা বাড়ি আছে শুনেছি। সেখান থেকে ভাড়ার টাকা পাচ্ছো না ? কিংবা বিলেতেই আবার ফিরে যাচ্ছো না কেন ?

কমলজ্যোতি অবাক হয়ে বললো, বিলেতে আমার বাড়ি আছে ? কে বললো ? এই ডাহা মিথ্যেটা তো ভাই আমি বলিনি।

আমি প্রদীপের দিকে তাকালাম। প্রদীপ মিটমিটিয়ে হেসে বললো, এটা মোটেই ডাহা মিথ্যে নয়। কমলজ্যোতি বিলেতে

বড় চাকরি করতো। আট দশ বছর চাকরিতে লেগে থাকলে ও একটা বাড়ি কেনার টাকা জমিয়ে ফেলতে পারতো না? অন্তত ইনস্টলমেণ্টেও কিনতে পারতো। কি রে পারতি না?

কমলজ্যোতি বললো, তা হয়তো পারতাম।

প্রদীপ বললো, তা হলেই ছাখ, আমি ঠিক মিথ্যে বলিনি। একটু অ্যাডভান্স বলে ফেলেছি।

আমি বললাম, কমলজ্যোতি, তুমি বিলেতে ফিরে গেলে আবার চাকরি জোগাড় করতে পারবে না? তোমার তো পাশপোর্ট আছেই।

—তাও হয়তো পারি। কিন্তু আমার ফিরে যাবার ভাড়াই নেই।

—সেটা একটা সমস্যা নয়। ভাড়ার টাকা কোনো রকমে জোগাড় হয়ে যেতে পারে ঠিকই।

—কিন্তু ফিরে যাওয়া মানেই তো হেরে যাওয়া।

—কিসের হেরে যাওয়া? কার সঙ্গে লড়াই?

—সে আছে একটা ব্যাপার।

—তাহলে এখানেই একটা চাকরির চেষ্টা-টেষ্টা করো। চাকরির বাজার অবশ্য খুব টাইট এখন—কিন্তু তোমার বিলিতি ডিগ্রি—তুমি একটু চেষ্টা করলে পেয়ে যাবে। বিলিতি ডিগ্রি সম্পর্কে এদেশে এখনো অনেকের মোহ আছে।

কমলজ্যোতি উদাসীনভাবে বললো, কী হবে চাকরি-বাকরি খুঁজে। এই তো বেশ আছি!

প্রদীপ বললো, হ্যাঁ, এই বেশ আছিস। সুনীলটার খালি ঝোঁক সাকসেসের দিকে।

আমি প্রদীপকে ধমক দিয়ে বললাম, বাজে বকিস না। যা বুঝিস না, সে সম্পর্কে কথা বলতে আসিস কেন?

কমলজ্যোতির দিকে ফিরে বললাম, তুমি এতকাল বিলেতে থেকেও একরম বিচ্ছিরি সেন্টিমেণ্টাল হলে কি করে? একটা

সামান্য মেয়ের জন্য জীবনটাকে এরকম নষ্ট করার কোনো মানে হয় না!

প্রদীপ বললো, মেয়ে? এর মধ্যে আবার মেয়ের ব্যাপার আছে নাকি? ও হ্যাঁ, তা তো থাকবেই—ওরাই তো যত নষ্টের গোড়া! কোন মেয়ে? কি করেছে সে?

কমলজ্যোতি বললো, তুমি তাকে দেখলে বুঝতে, সে মোটেই সামান্য মেয়ে নয়। তার জন্য যে কোনো লোক জীবন নষ্ট করতে পারে।

—আমি তাকে দেখেছি। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। আমি অন্তত তার জন্য জীবন নষ্ট করতাম না।

কমলজ্যোতি অবাক হয়ে বললো, তুমি তাকে চেনো?

—নিশ্চয়ই! তোমাকে সেদিন বললাম না ও মাধুরীর বান্ধবী। মেয়েটি এমনিতে ভালো, গান করেও চমৎকার, কিন্তু তার জন্য সারাটা জীবন হা-হুতাশ করার কোনো মানে হয় না। তারচেয়ে তুমি যদি মল্লিকার সঙ্গে—

কমলজ্যোতি একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললো, থাক্, ও কথা বলো না!

প্রদীপ বললো, তোরা বড্ড বড় বড় কথা বলছিস। জীবন নষ্ট করা-টরা আবার কি? একটা লোক চাকরি-বাকরি না করে কাটিয়ে দিলেই কি জীবন নষ্ট করা হয়! যার যে রকমভাবে ভালো লাগে। কোন মেয়ের কথা বলছিস রে সুনীল? আমি তাকে চিনি? না চিনলেও নাম বল্, আমি তাকে হিড়হিড় করে ধরে নিয়ে আসি এখানে।

—ধরে নিয়ে এসে কি করবি?

—কমলজ্যোতির যাতে জীবনটা নষ্ট না হয়—এবং মেয়েটারও যাতে জীবন নষ্ট না হয়—সেই ব্যবস্থা করবো।

—তুই যে-কোনো মেয়েকে এরকম জোর করে ধরে আনতে পারিস?

—আলবাৎ পারি। আমার বন্ধুর জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।

—মেয়েটি বিবাহিতা। গায়িকা হিসেবে সুনাম আছে। নিজের জীবন নিয়ে সে সুখী। তাকে তুই জোর করে ধরে আনতে চাস?

প্রদীপ ওর গেলাসটা টক্ করে মেঝেতে নামিয়ে রেখে বললো, বিবাহিতা? যাঃ শালা! তার জন্য কমলজ্যোতি জীবন নষ্ট করবে কেন? পৃথিবীতে আর কোনো মেয়ে নেই?

কমলজ্যোতি বললো, এই মেয়েটি আমার মনের মধ্যে একটা সাঙ্ঘাতিক আঘাত দিয়ে গেছে। আমি ভুলতে পারি না। আমি ওকে ভালোবেসে ছিলাম, কিন্তু ও আমাকে ঘৃণা করেছে।

প্রদীপ বললো, তুই-ই বা যাকে তাকে হঠাৎ ভালোবাসতে গেলি কেন?

—যাকে তাকে নয়। আমি জীবনে ঐ একটি মাত্র মেয়েকেই ভালেবেসেছি।

—বিলেতে কোন মেম্-টেম্-এর সঙ্গে তোর পরিচয় ছিল না বলতে চাস?

--অনেকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু মায়া নামে ঐ একটি সাধারণ বাঙালী মেয়ে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালোবাসি নি।

—বিলেতে গিয়েও সেই বাঙালী মেয়ের ঝঞ্ঝাট। প্যাচপেচে প্রেম? আশ্চর্য ব্যাপার মাইরি!

এক চুমুকে গেলাসের সবটুকু শেষ করে কমলজ্যোতি বললো, সত্যি আশ্চর্য। বিলেতের বাঙালীদের সঙ্গে আমি তেমন মিশতাম না। টম ডিক হ্যারির দলই ছিল আমার বন্ধু-বান্ধব। একটা বিদায় সম্মিলনীতে সেই যে মেয়েটিকে প্রথম দিন দেখলাম, সেই দিনটার কথা আমি কখনো ভুলবো না। একটা সাধারণ লাল পাড়ের শাড়ি পরে বসেছিল, কপালে একটা লাল রঙের টিপ।

অত সাদাসিধে পোশাকে বিলেতে কোনো বাঙালী মেয়েকে আমি আগে দেখিনি। সেই মেয়েটি আমাকে গ্রাহ্যই করলো না একেবারে। আমি কথা বলতে গেলাম, পাত্তাই দিল না।

কমলজ্যোতি এই সব কথা আমাকে আগেও কয়েকবার বলেছে। কিন্তু বারবার বলেও যেন ওর আশ মেটে না! বিলেতে মায়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিনটায় সত্যিই ও বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছিল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিন্তু কমলজ্যোতির বিবর্ণ মুখ দেখলে মনে হয়, পৃথিবীতে এখনও এরকম ঘটে।

প্রদীপ হা হা করে হাসতে লাগলো। বেশ জোরে জোরে, একটানা। নেশার ঝোঁকের হাসি। যেন এই সব প্রণয়-ভালোবাসা নিছক বিদ্রূপেরই ব্যাপার।

—আমার দোষের মধ্যে এই ছিল, আমি ভালো বাংলা বলতে পারতাম না। সেটা কি আমার সত্যিকারের দোষ? আমি বাংলা শিখবো কি করে? বাংলা গান, বাংলাদেশের কালচার— এসব তো আমি ভালোবাসতে শিখি নি!

প্রদীপ বললো, তা হলে হঠাৎ একটা বাঙালী মেয়েকে ভালোবাসতে শিখলি কোথায় চাঁদ? বাঙালী মেয়েকে ভালোবাসার জন্য কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? বেশতো একটা বেড়ালচোখো মেমকে বিয়ে করে লণ্ডনে ঘর-সংসার করে সুখে থাকতে পারতি।

—সেইটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে সব কিছুর তো হিসেব মেলে না! ঐ একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। আমার সব চেয়ে দুঃখ কি জানিস, আমাকে তৈরী হবার সুযোগ দিল না। আমি ওর যোগ্য হতে পারতাম কিনা সেটা দেখার জন্যও অপেক্ষা করলো না। দুম করে একটা ভালো ছেলে মার্কা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বিয়ে করে ফেললো। আমি ওকে দেখিয়ে দিতে চাই, আমি ওর যোগ্য হতে পারি কি না।

—এখন আর দেখিয়ে দিয়ে কি করবি? এখন ওর বিয়ে হয়ে গেছে, সুখে শান্তিতে আছে।

—ডাম্ ইট। আমাকে অশান্তি দিয়ে ও সারা জীবন শান্তি পেতে পারে? ডিভোর্স করে ও আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য।

আমি কমলজ্যোতির কাঁধে হাত রেখে নম্রভাবে বললাম, কমলজ্যোতি, এসব কি ছেলেমানুষী হচ্ছে? মায়া সেনগুপ্তা ডিভোর্স করে তোমার কাছে চলে আসবে, এসব কি পাগলামি চিন্তা তোমার?

কমলজ্যোতি বললো, যদি না আসে, আমি সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দেবো। আমি আর কিচ্ছু চাই না!

কমলজ্যোতি ওর হাতের কাঁচের গেলাসটা ছুঁড়ে দিল মাটিতে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো।

প্রদীপ বললো, এ রকম পাগলামি করলে কোন লাভ হবে না। তুই যদি শোধ নিতে চাস্, তাহলে সত্যিই একটা চাকরি জোগাড় করে ফ্যাল। বেশ মোটা মাইনের চাকরি, রোজ গাড়ি হাঁকিয়ে যাবি ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে—মায়া সেনগুপ্তা যে-সব ফাংশানে গাইবে—তুই সেখানে গিয়ে ফার্স্ট রো-তে বসবি—

—না, আমি ওর উপর কোনো শোধ নিতে চাই না। আমি দেখিয়ে দিতে চাই, আমি ওর যোগ্য হতে পারতাম। এক বছরে আমি বাংলা শিখেছি, রবীন্দ্রনাথের অর্ধেক গান আমার মুখস্থ—

॥ ৮ ॥

মাধুরীর উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত মায়া সেনগুপ্তার সঙ্গে কমলজ্যোতির মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, দেখা না হলেই ভালো হতো।

কমলজ্যোতি দিন দিন অধঃপতনের দিকে যাচ্ছিল। হয়তো একে অধঃপতন বলা যায় না! এটা এক ধরনের ব্যর্থ সাধনা। মায়া সেনগুপ্তাকে ও আর পাবে না জেনেও তার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলা। টাকা পয়সা সব গেছে, এখন এমন দিনও যায় যে কমলজ্যোতির ভালো করে খাবারই জোটে না। তবু জেদ ছাড়বে না। দেখা হলে সর্বক্ষণ শুধু মায়ার কথা। অন্য কোনো মেয়ের দিকে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মল্লিকাও আর আসে না।

মাধুরীর জন্মদিনে মায়া সেনগুপ্তাকে গান গাইতে বলেছিল। সেদিন কমলজ্যোতিকেও নেমন্তন্ন করলো। আমিই নিয়ে গেলাম কমলজ্যোতিকে। কমলজ্যোতি ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে এসেছে, বেশ মানিয়েছে ওকে। মায়াকে দেখে কমলজ্যোতি আড়ষ্ট হয়ে গেল। একটাও কথা বললো না। কমলজ্যোতির সুন্দর চেহারা ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য সবারই চোখ পড়ে ওর দিকে। কিন্তু মায়া ওকে একবার দেখতে পেল না? কিংবা দেখেও চিনতে পারার কোনো ভাব দেখালো না।

ওদের দু' জনকেই আগে থেকে কিছু বলা হয় নি। কমলজ্যোতিকে শুধু বলা হয়েছিল, মাধুরীর জন্মদিনে কয়েকজন রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবেন। ও গান শুনতেই এসেছিল। মায়া সেনগুপ্তা যখন গান করলো, তখন কমলজ্যোতি খানিকটা দূরে এমন ভাবে বসেছিল, যেন একটা পাথরের মূর্তি। ওর মুখে সেদিন কি ছিল,

রাগ না অভিমান? হয়তো তীব্র অভিমানেই মানুষের মুখটা পাথরের মতন দেখায়।

মাধুরীই ব্যবস্থা করে এক সময় একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে এলো মায়াকে। আমি কমলজ্যোতিকে নিয়ে গেলাম। দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কমলজ্যোতি নার্ভাস হয়ে একটু একটু কাঁপছে। মায়ার মুখে সামান্য একটু রাগের চিহ্ন।

ঘরখানা মাধুরীর দাদার। উনি কি কাজে দিল্লী গেছেন। মাধুরীর দাদা একটু অগোছালো স্বভাবের, ঘর ভর্তি বই পত্র ছড়ানো। একটা খাট, একটা টেবিল, একটা চেয়ার—এই হলো ঘরের আসবাব।

মাধুরী আর মায়া বসলো খাটে, কমলজ্যোতিকে দেওয়া হলো চেয়ারটা, আমি জানালার ওপরে বসলাম।

মাধুরী চা আনতে গেল। মায়া সেনগুপ্তা মুখ নীচু করে বিছানার চাদরের ওপরে দাগ কাটছে, যেন ছবি আঁকছে। কমলজ্যোতি একাগ্রভাবে দেখছে সেই অদৃশ্য ছবি!

নীরবতা ভেঙে আমিই প্রথমে বললাম, মায়া, আপনার গান কিন্তু আজ তেমন ভালো হয় নি।

মায়া চমকে মুখ তুললো।

আমি একটু হেসে আবার বললাম, অন্যদিন আপনার গান এর চেয়ে অনেক ভালো হয়। আজ যেন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন মনে হচ্ছিল।

মায়া বললো, অন্যমনস্ক, না, তা ঠিক নয়। সবদিন তো একরকম হয় না।

—আচ্ছা, আপনি তো শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন, তাই না?

—না তো!

—কার কাছে গান শিখেছেন!

—আমি বলতে গেলে প্রায় নিজে নিজেই—কিছুদিন জর্জদার কাছে শিখেছিলাম, তাও মাত্র কয়েক মাস।

—আপনার প্রথম রেকর্ড তো অনেকদিন আগে বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ, সেই যে একবার কমপিটিশান হলো না—রেডিওতে এক বছর নতুন যারা যারা গান করেছিল তাদের গান বিচার করা হলো—সেবার আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম, সেইজন্যই রেকর্ড কোম্পানী—

এটা কি আপনার বিলেত যাবার আগে ?

—হ্যাঁ।

—বিলেতে আপনার গায়িকা হিসেবে খুব নাম হয়েছিল, আমি শুনেছি।

—মাঝে মাঝে গাইতাম।

আমি তখন কমলজ্যোতির দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, আমার এই বন্ধু তখন বিলেতে আপনার গান শুনেছে। আপনার সঙ্গে পরে আলাপও হয়েছিল।

মায়া শুকনো ভদ্রতার সঙ্গে বললো, নমস্কার।

এই সময় মাধুরী চা নিয়ে ঢুকলো। হাসি মুখে বললো, কি, আলাপ পরিচয় হয়েছে তো ?

আমি বললাম, আলাপ তো আগে থেকেই ছিল।

মায়া বললো, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

—এর নাম কমলজ্যোতি—

কমলজোতি এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি। এবার একটু আড়ষ্ঠভাবে বললো, তখন আমাকে সবাই বলতো কে. জে.—হয়তো উনি কমলজ্যোতি শুনে বুঝতে পারবেন না।

আমি বললাম, তা ছাড়া ধুতি পাঞ্জাবি পরতো না বলাই বাহুল্য।

মায়া সম্পূর্ণ ব্যাপারটা উপেক্ষা করে মাধুরীর দিকে ফিরে বললো, এবার কিন্তু আমি যাবো রে!

মাধুরী বললো, তুই কিন্তু ভদ্রলোককে বড্ড কষ্ট দিয়েছিস ?

মায়া খানিকটা বিস্ময় খানিকটা রাগের সঙ্গে বললো, কষ্ট ? আমি কি কষ্ট দিয়েছি ? কি বলছিস তুই !

—ভদ্রলোককে একেবারে পাত্তাই দিস নি ! উনি তোর জন্মই এতদূর ছুটে এসেছেন—এখন খুব ভালো বাংলা টাংলা শিখে—

মায়া খাট থেকে নেমে বললো, এবার আমি যাবো

-- চা-টা শেষ করে নে আগে।

—না, আর চা খাবো না।

কমলজ্যোতিও উঠে দাঁড়ালো। এক পা এগিয়ে এসে বললো, মায়া তুমি আমাকে চিনতে পারলে না ?

মায়া আমার দিকে ফিরে বললো, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এরকম জোর করে চিনতেই বা হবে কেন !

আমি বললাম, আপনি এত সীরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন কেন ? একটু বসে খানিকক্ষণ গল্প করলে কি এমন অন্যায় হবে ?

কমলজ্যোতি বললো, তোমার মনে পড়ছে না, কেনসিংটন গার্ডনস-এ সেই এক শনিবার সন্ধ্যেবেলা, আমি তোমাকে বলেছিলাম—

মায়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, হ্যাঁ, মনে আছে। আপনাকে আমি সেদিনও বলেছিলাম, আজও আবার বলছি, আপনার রুচি আর আমার রুচি এক নয়। আপনার সঙ্গে আমার কোনো দিক থেকেই মিল নেই, সুতরাং—

—কিন্তু মানুষ কি বদলায় না ? সেদিনের পর থেকে আমি অনেক বদলে গেছি। আমি চেষ্টা করেছি নিজেকে যোগ্য করে তোলার !

—খুব ভালো কথা। আপনি একটু সরে দাঁড়ান, আমি এখন যাবো, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি আমাকে এখনো অপমান করার চেষ্টা করছো ! কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কখনো ভালোবাসিনি—এখনো আমি তোমার জন্য—

মায়া তীব্রভাবে বললো ছিঃ !

তারপর মাধুরীর দিকে ফিরে বললো, এই সব আজে বাজে কথা শোনার জন্য তুই আমাকে এখানে ডেকেছিস।

কমলজ্যোতির মুখখানা কালো হয়ে গেল। চোখ দুটি বিস্ফারিত। যেন শরীরটা কাঁপছে। আর যাই হোক, ভালো-বাসার উত্তরে যদি কেউ ছিঃ বলে সেটা সহ্য করা নিশ্চয় শক্ত। মায়া এত কঠোর না হলেই পারতো। খানিকটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর হাসি তামাশায় ব্যাপারটাকে অনায়াসেই হালকা করে দেওয়া যেত।

আমাদের হতবাক করে দিয়ে কমলজ্যোতি ঠাস করে চড় মারলো মায়ার গালে। বেশ জোরে। একটা আর্ত শব্দ করে গালে হাত চেপে মায়া দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখে ব্যথার চেয়েও বিস্ময় অনেক বেশী।

ঘোর কাটতে আমার কয়েক মূহূর্ত্ত লাগলো। তারপর আমি দৌড়ে এসে কমলজ্যেতিকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, এই, কি করছো পাগলের মতন!

পরের মুহূর্তেই কমলজ্যোতি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। বিহ্বল ভাবে বললো, এ আমি কি করলাম! আমায় ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো—

এরপর দু'তিন মাস কমলজ্যোতির আর কোনো সন্ধান পাইনি। ওর ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। তবে বিলেতে ফিরে যায় নি। প্রদীপ বললো, ওর সঙ্গে নাকি মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা হয়। প্রদীপ আফশোস করে বলে, ছেলেটা একেবারে বদলে গেছে। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। বাংলা-টাংলাও খায় না।

আমার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে একদিন কমলজ্যোতির দেখা হয়ে গেল মাস চারেক পরে। ও একটা লোক্যাল ট্রেন ধরার জন্য

দৌড়ে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। হাসি মুখে বললো, কী, কেমন আছো?

আমি বললাম, তুমি কেমন আছো? তোমার খবর কি?

স্টেশনের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কমলজ্যোতি বললো, আমার ট্রেনটা বোধহয় ছেড়ে গেল। যাক গে পরের ট্রেনে যাবো। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক্।

—কোথায় যাচ্ছিলে কোথায়?

—আমি এখন কোতরং-এ থাকি।

—কোতরং? সেখানে কি করছো?

কমলজ্যোতির পরনে পাঞ্জাবী ও পায়জামা। দু'তিনদিন দাড়ি কামায় নি। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। এক গাল হেসে বললো, আমি ওখানে মাস্টারি করছি একটা স্কুলে। এই তো দেড় মাস হলো। তুমি আসবে একদিন আমার ওখানে? দারুণ খেজুরের রস পাওয়া যায়। তোমাকে খাওয়াতে পারি। জান তো, কোতরং-এর পাটালী খুব বিখ্যাত।

আমি অস্ফুটভাবে বললাম, তুমি মাস্টারি করছো?

—হ্যাঁ। খুব ভালো লাগছে আমার। ছেলেরা এর মধ্যেই আমাকে বেশ ভালোবেসে ফেলেছে। আমি একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়েছি। সামনে একটা বাগান। এখন এই শীতকালে দারুণ ফুল ফোটে। নিজের হাতেই রান্না করি। তুমি আমাকে ঠাট্টা করেছিলে চা বানাতে পারি না বলে—কিন্তু এখন আমি ডাল, তরকারি, মাছ ভাজা সব পারি। খাবে একদিন আমার হাতের রান্না? কবে আসবে বলো।

আমার ট্রেনের তখনও খানিকটা দেরী ছিল। কমলজ্যোতিকে নিয়ে আমি কফির দোকানে বসলাম। ওকে দেখে তখনও আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিলাম, সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। এর মধ্যে বেশ রোগা হয়ে গেছে কমলজ্যোতি, রোদ্দুরে ময়লা হয়ে গেছে গায়ের রং,

পাঞ্জাবীটা ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া। মুখে কিন্তু ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই।

একটু বাদে জিজ্ঞেস করলাম, কমলজ্যোতি, সত্যিই তুমি ভালো আছো?

—হ্যাঁ, ভাই গ্র্যাণ্ড আছি।

—বিলেতে আর ফিরবেই না তা হলে?

—নাঃ! আর ইচ্ছে করে না।

—গ্রামে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না কিছু?

—অসুবিধে আবার কি? কত লোক তো থাকে।

- মায়ার কথা আর মনে পড়ে না?

—হ্যাঁ, মনে পড়ে মাঝে মাঝে। তবে আগের মতন আর মন খারাপ হয় না।

একটু চুপ করে থেকে কমলজ্যোতি মাথা নীচু করলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, মায়াকে না পাবার জন্য সত্যিই আমার আর কোনো দুঃখ নেই। বরং মায়াকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। মায়ার জন্য আমি আমার দেশটাকে ফিরে পেয়েছি। এতদিন আমার কোনো দেশ ছিল না। এখন আমি নিজেকে সত্যিকারের বাঙালী বলতে পারি। পারি না?

অন্যায় খেলা

এখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা বাজে। আচার্যমশাই দাবা খেলতে বসেছেন। ঘরের দরজাটা ভেজানো, বাইরে টুলের ওপর বসে পাহারা দিচ্ছে,—কোনো দারোয়ান নয়—পার্টির একজন বিশ্বস্ত কর্মী। বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারুর এখন ঘরে ঢোকা নিষেধ।

এমন গভীর মনোযোগ দিয়ে আচার্যমশাই দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে আছেন যে দেখলে কে বিশ্বাস করবে, এই মানুষটিই সারা সপ্তাহে কত ব্যস্ত থাকেন। অসংখ্য লোক, বহু রকমের দায়িত্ব। দেশের অনেক লোকের ভাগ্য নির্ভর করছে তাঁর ওপর।

আচার্যমশাই কোনো গুরুদেব বা অধ্যাপক-টধ্যাপক নন। তিনি রাজ্যের একজন পূর্ণ মন্ত্রী তো বটেই, পার্টির ওপর তাঁর কর্তৃত্বও অনেকখানি। সরকার ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে তাঁর মতামতের যথেষ্ট দাম আছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও এই রাজ্যের যে-কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে আচার্যমশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

তবে, আচার্যমশাইয়ের একটি কঠোর নিয়ম আছে। রবিবার তিনি কোনো সভাসমিতিতে যান না, পার্টির কাজেও মাথা ঘামান না। নেহাত রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসফরে এলে তাঁকে কদাচিৎ এই নিয়ম ভাঙতে হয় বটে, কিন্তু তখন তাঁর মুখখানা বেশ গম্ভীর দেখায়। রবিবার দিনটা তিনি শুধু নিজের জন্য আলাদা করে রাখেন।

রবিবার সকালটা তিনি শুধু মেশেন তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে—রাজনীতির সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনদের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের তিনি আনতে বলেন, তাদের নানারকম উপহার দেন। শিশুদের সঙ্গে নিজেও কিছুক্ষণ

শিশু হয়ে গিয়ে খেলাধুলো করেন। আচার্যমশাইয়ের মতে শিশুদের সঙ্গে না মিশলে কোনো মানুষ দীর্ঘজীবী হতে পারে না।

আচার্যমশাই নিজে নিঃসন্তান, তাঁর স্ত্রীও মারা গেছেন অনেকদিন আগে।

বয়েস তেষট্টির মতন, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো আছে। বিশাল চেহারা, মাথায় টাক পড়েনি এবং অনেক চুলই এখনো কালো। ওঁর বাঁ হাতের অনামিকায় একটি পলার আংটি এমন ভাবে আঁট হয়ে আছে যে গত কুড়ি বাইশ বছর ধরে সেটা খোলাই যায় নি। অনেকে বলে, ঐ আংটিটাই তাঁর সৌভাগ্যের মূল।

রবিবার দুপুরে তিনি খাওয়া দাওয়ার পর এক ঘণ্টা বই পড়েন, তারপর ঠিক দু' ঘণ্টা ঘুমোন। সপ্তাহের আর কোনোদিন তাঁর দিবানিদ্রা দেবার সুযোগ নেই। ঘুম থেকে চা-টা খেয়ে তিনি দাবা খেলতে বসেন। কতক্ষণ সে খেলা চলবে তার ঠিক থাকে না।

গত বছরখানেক ধরে তিনি দাবা খেলছেন শুধু একজনেরই সঙ্গে। ছেলেটির বয়েস তাঁর অর্ধেকেরও কম। হিমাদ্রিশেখরের বয়েস এখনো তিরিশও হয়নি। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, প্যাণ্টের সঙ্গে সব সময় ফুলহাতা শার্ট পরে, ভালোমানুষের মতন মুখ। হিমাদ্রিশেখর কথা বলেও খুব কম।

হিমাদ্রিশেখর বললো, আপনি কি আপনার গজের চালটা ফেরত নেবেন?

আচার্যমশাই বললেন, কেন?

—না হলে তো মাত্ হয়ে যাবেন এবারেই।

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠলো। আচার্যমশাই তবু তাকিয়ে রইলেন দাবার ছকের দিকে। টেলিফোন বাজতেই লাগলো।

রবিবার সন্ধ্যেবেলা অন্য লোকের দেখা করা নিষিদ্ধ হলেও টেলিফোনে ডাক আসতে তো বাধা নেই। টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখাও যায় না, কারণ সত্যিই কোনো জরুরী ডাকও তো আসতে পারে।

ঘরে তিন রঙের তিনটে টেলিফোন। গোলাপী, সাদা ও কালো। কোনটা কখন বাজবে তার ঠিক নেই।

একটু বাদে আচার্যমশাই সাদা টেলিফোনটা তুলে নিলেন। খুব শান্ত ভাবে শুনলে ওদিককার কথা। তারপর অত্যন্ত বিরক্তভাবে বললেন, এ খবরটা কাল দিলে চলতো না? হুগলীর এস পিকে বলো, দশ বারোজনকে অ্যারেস্ট করতে। আমার নাম করে বলবে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, হুঁ, তাই তো দেখছি।

গজের চালটা ফেরত না নিলে সত্যিই তাঁকে এবারে মাত্ হয়ে যেতে হবে। অথচ চাল ফেরত নিতে তিনি খুব অপমানিত বোধ করেন। জীবনে তিনি কখনো কথা দিয়ে কথা ফেরান নি, কিন্তু দাবায় তাঁকে বার বার হার স্বীকার করতে হয়।

হিমাদ্রিশেখর ছেলেটা অদ্ভুত খেলে। একবারও তাকে হারাতে পারেন নি আচার্যমশাই। কয়েকবার খেলা ড্র হয়েছে, কিন্তু সে-সব বারেও হিমাদ্রিশেখরের চালে কোনো ভুল হয়নি।

দাবা খেলার অভ্যেসটা হয়েছিল জেলখানায়। স্বাধীনতার আগে তিনি বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন। সেখানে মাটিতে ছক কেটে নানারকম ইঁট-পাথরের টুকরো দিয়ে খেলা চলতো। পরে অবশ্য সেপাইদের ঘুষ দিয়ে আসল বোর্ড আর ঘুঁটি যোগাড় করা হয়েছিল।

সেই সময় আচার্যমশাই বেশ ভালো খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তিনি দাবা খেলায় হারিয়েছেন অতুল্যবাবুকে, শ্যামাপ্রসাদকে। গোবিন্দবল্লভ পন্থ কিংবা ভি কে মেননও তাঁর সঙ্গে পারেন নি।

হিমাদ্রিশেখর তাঁর বন্ধুর ছেলের বন্ধু। তাঁর বন্ধু অখিল সান্যালের ছেলে সুশোভন প্রায় তাঁর নিজেরই ছেলের মতন। এ বাড়িতে তার অবারিত দ্বার। সেই সুশোভনের সঙ্গে হিমাদ্রিশেখরকে

একদিন দাবা খেলতে দেখে আচার্যমশাই দু' একটা মন্তব্য করেছিলেন। হিমাদ্রিশেখর তখন বলেছিল, আপনি যেভাবে বলছেন, সেই ভাবে খেললে সুশোভন নির্ঘাত হারবে।

আচার্যমশাই কথাটা শুনে অবাক্ হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কেউ এ ভাবে কথা বলে না। সকলেই তাঁকে ভয় পায়। সকলেই তাঁকে খাতির করে। যারা খবরের কাগজে তাঁর নামে গালাগালি ছাপায়, তারাও আচার্যমশাইয়ের সামনে এসে বিগলিত হয়ে যায়। পার্টির কোনো জুনিয়ার কর্মী ভালো দাবা খেলতে জানলেও তাঁর সঙ্গে খেলতে বসলে ইচ্ছে করে হারে। আর এই ছেলেটা বলে কি?

সুশোভনকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে খেলতে বসলেন। এবং পর পর দু' দানই হারলেন।

সেই থেকে তাঁর একটা জেদ চেপে গেছে। প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যেবেলা তিনি হিমাদ্রিশেখরকে ডেকে এনে খেলতে বসেন। আজ পর্যন্ত একবারও জিততে পারেন নি, অথচ ওকে একবার অন্ততঃ হারাতে না পারলে তিনি জীবনে যেন কিছুতেই শান্তি পাবেন না।

হিমাদ্রিশেখর ঘোড়ার নতুন চাল দিয়ে বললো, কিস্তি!

আবার টেলিফোন বাজলো। এবার গোলাপী। রিসিভারটা তোলার আগে তিনি দেখে নিলেন নিজের রাজাকে। আর বাঁচবার কোনো রাস্তা নেই। এবার সত্যিই মাত্।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বার বার টেলিফোন আসে, আমার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

হিমাদ্রিশেখর কোনো উত্তর দিল না। আচার্যমশাই যতক্ষণ টেলিফোনে কথা বললেন, সে চুপ করে রইলো, তারপর বললো, আজ এই পর্যন্তই থাক্।

আচার্যমশাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, না, আরও এক দান খেলা হোক না, রাত তো বেশী হয় নি।

হিমাদ্রিশেখর হাতের ঘড়ির দিকে এক নজর বুলিয়ে খানিকটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই বললো, আচ্ছা!

হিমাদ্রিশেখরকে আচার্যমশাই দাবা ছাড়াও অন্য কোনো ব্যাপারেও হারাতে পারেন নি। ছেলেটাকে যত দেখছেন, ততই আশ্চর্য হচ্ছেন। প্রায় এক বছর ধরে প্রত্যেক রবিবার আসছে সে, কিন্তু এ পর্যন্ত একবারও সে মুখ ফুটে কিছু চায় নি নিজের জন্য। একজন প্রতাপশালী মন্ত্রীর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেও কেউ নিজের খানিকটা সুবিধে আদায় করে নিতে চায় না—আচার্যমশাই এরকম আর দেখেন নি। আচার্যমশাই নিজে থেকেও তাকে কয়েকটি লোভজনক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে প্রত্যাখ্যান করেছে। কোনো বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের জন্যও সে কোনদিন কোনো টেলিফোন কানেকশান বা থানা থেকে কারুকে ছাড়ানো বা লাইসেন্স—কিছুই চায় নি।

হিমাদ্রিশেখর কাজ করে একটি ব্যাঙ্কে, মোটামুটি মাঝারি ধরনের চাকরি। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই সম্পর্ক নেই। আচার্যমশাই এটুকু আগেই খোঁজ নিয়েছিলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে ওর কোনো যোগ আছে কিনা। শুধু তাই নয়, ওর সামনেই তাঁকে টেলিফোনে এমন অনেক কথাবার্তা বলতে হয়, যা বাইরে ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ আছে। কিন্তু সে-রকম ঘটনাও কক্ষনো ঘটে নি।

ছেলেটাকে কোনো দিক থেকে হারাতে না পারায় আচার্যমশাই ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা বোধ করেন। হিমাদ্রিশেখরের ওপর তাঁর যে কোনো রাগ আছে তা নয়—কিন্তু তাকে যদি কোনো চালে হারানো যেত—তা হলে তিনি তাকে ভালোবাসতে পারতেন।

পরের খেলার মাঝখানে ঘরের দরজা ঠেলে একটি মেয়ে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো এক ঝলক টাটকা হাওয়া খেলে গেল ঘরের মধ্যে। মেয়েটির নাম মন্দিরা। এ হলো সেই রকমের মেয়ে, যাকে

দেখলে সকলেরই মন ভালো হয়ে যায়। মন্দিরাকে কেউ কখনো গম্ভীর হতে দেখেনি। অন্যদের গামড়া মুখও সে সহ্য করতে পারে না। তার হাস্যময় মুখখানি যেন আলো ও রূপ দিয়ে সাজানো। সাজ-পোশাকের দিকে কোনো যত্ন নেই, তবু মন্দিরার স্বাস্থ্য তার পোশাক ছাপিয়ে ফুটে ওঠে।

সাধারণ একটা রঙীন তাঁতের শাড়ি পরে আছে মন্দিরা, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, এক হাতে হিন্দুস্থানী ঘুঁটেওয়ালীদের মতন একটা মোটা রূপোর বালা, আর কোনো অলংকার নেই। মন্দিরা সদ্য অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করেছে। বস্তির ছেলেদের নিয়ে একটা নাইট স্কুল চালায়।

মন্দিরা এসে ওদের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। দু'জনেই খেলাতে এত এত মগ্ন যে একবারও চোখ তুলে তাকালো না। দু'জনেই একাগ্রদৃষ্টিতে ঘুঁটির দিকে তাকিয়ে আছে।

—দাদা, আপনি এখন খেতে যাবেন না?

আচার্যমশাই মুখ না তুলেই মন্দিরাকে উত্তর দিলেন, দাঁড়া, আর একটু পরে।

মন্দিরা এবার হাঁটু মুড়ে পাশে বসে পড়ে বললো, সাড়ে ন'টা বাজে কিন্তু!

—বাজুক না। আর বেশীক্ষণ লাগবে না।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে কিন্তু।

—তুই একটু চুপ করে বোস্ তো। কথা বলিস না। আচার্যমশাই অন্যমনস্ক ভাবে মন্দিরার একটা হাত তুললেন নিজের হাতে। তারপর শক্ত ভাবে চেপে ধরে রইলেন।

হিমাদ্রিশেখর চোরা চোখে সেদিকে দু' একবার তাকালো। মন্দিরার মুখের দিকে তাকালো না। সে শুধু দেখছে আচার্যমশাইয়ের লোমশ বিশাল হাতের মুঠোর মধ্যে মন্দিরার ছোট্ট নরম হাতখানা।

—এবার তোমাকে কিস্তি দিলাম!

আচার্যমশাইয়ের গলার মধ্যে রীতিমতন উল্লাস ফুটে উঠেছে। এবার তিনি হিমাদ্রিশেখরকে প্যাঁচে ফেলতে পেরেছেন। এবার সে যাবে কোথায়?

হিমাদ্রিশেখর অবাক্ হয়ে গেছে। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। নইলে এরকম ভুল হলো কি করে?

আচার্যমশাই আনন্দের সঙ্গে মন্দিরার বাহুতে চাপড় মেরে বললেন, তুই আর একটু বোস্। তুই এলেই আমার ভাগ্য ফেরে!

হিমাদ্রিশেখর ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে আছে বোর্ডের দিকে। তারপর তার ঠোঁটে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। না, তার ভুল হয় নি। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলেই সব দিক দেখতে পায় নি। দূর থেকে তার নৌকোটা টেনে এনে সে প্রায় হিংস্র ভাবে বললো, এ কিস্তির কোনো মানে হয় না। গেল আপনার মন্ত্রী! নৌকোটা দিয়ে এক ধাক্কায় সে উলটে দিল মন্ত্রীটা।

পরক্ষণেই আবার বিনীত ভাবে বললো; এটা খুবই সোজা চাল। আপনার মন্ত্রীর চালটা ফেরত নেবেন?

আচার্যমশাইয়ের মুখে একটা অপমানের ছাপ পড়েছে। হিমাদ্রিশেখরের নৌকোটা তিনি দেখতেই পান নি। হিমাদ্রিশেখর প্রত্যেক বারই তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তিনি চাল ফেরত নেবেন কিনা। অথচ নিজে সে একটা চালও ফেরত নেয় না।

মন্দিরা বললো, খেলা শেষ হতে তো অনেক দেরি আছে দেখছি। এবার খেয়ে নেবেন চলুন।

—না, খেলাটা শেষ করে নিই।

—কি যে খেলা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকা—একঘেয়ে লাগে না?

—এতে মাথা পরিষ্কার হয়। তুই তো শিখলি না খেলাটা।

—আমার দরকার নেই!

মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত অনুসারে আমাদের দেশের অনেক বর্ষীয়ান নেতাই পাশে দু' একটা সুন্দরী মেয়ে রাখে। কাঁধে হাত

রাখার জন্য। মন্দিরাও আচার্যমশাইয়ের সঙ্গে অনেক সভাসমিতিতে যায়। নির্বাচন সফরেও সঙ্গিনী হয়। এজন্য অবশ্য কেউ কোনো কুৎসা রটনা করার সুযোগ পায় নি। আচার্যমশাইয়ের চরিত্রে সে রকম কোনো দোষ সত্যিই নেই। তাছাড়া, মন্দিরা সম্পর্কে তাঁর নাতনী হয়। তাঁর এক মামাতো দিদির মেয়ের মেয়ে। মন্দিরার পড়াশুনা চালাবার ব্যাপারে আচার্যমশাই অনেকখানি করেছিলেন। তাছাড়া ওর সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে তাঁর ভালো লাগে। মন্দিরাও আচার্যমশাইয়ের কিছু কিছু তত্ত্বাবধান করে যায়। কাছেই তাদের বাড়ি।

খেলা চলতেই থাকলো। কেউ কারুর কাছে যেন এবার হার মানবে না। এক একটা চাল দিতে দশ মিনিট পনেরো মিনিট কেটে যাচ্ছে। মন্দিরা অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে রইলো। তারপর এক সময় বললো, এর কোনো মানে হয়? দশটা বেজে গেল!

আচার্যমশাই বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া, আর একটু—

—না, এবার কিন্তু আমি সব কিছুই উলটে দেবো।

—তুই খাবার দিতে বল্ না। আমি এক্ষুনি আসছি।

—খাবার দেওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

—খেলাটা শেষ না করে যাই কি করে?

—খেলা এই পর্যন্ত থাক। আপনি খেয়ে আসুন, তারপর আবার খেলবেন।

—সেটা মন্দ বলিস নি! কি হিমাদ্রি, তুমি বসবে? আমি চটপট খেয়ে আসবো?

হিমাদ্রিশেখর নির্লিপ্তভাবে বললো, তা বসতে পারি!

—আমি বেশী দেরি করবো না।

আচার্যমশাই উঠতে গিয়েই উহ্ উহ্ শব্দ করে আবার বসে পড়লেন। মন্দিরার দিকে হাতটা বাড়িয়ে বললেন, পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। আমাকে একটু টেনে তোল তো।

মন্দিরা দু'হাতে আচার্যমশাইকে টানতে টানতে এবং হাসতে হাসতে বললো, উঠুন। পায়ে চিমটি কেটে দেবো?

হিমাদ্রিশেখর মাথা নীচু করে বসে রইলো।

আচার্যমশাই মন্দিরার কাঁধে হাত দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তিনতলা বাড়ি। অনেক লোক। পার্টির অনেক লোক এ বাড়িতেই থাকে। আচার্যমশাইয়ের নিকট আত্মীয় প্রায় কেউ নেই, এক ভাই মারা গেছে এক বোন থাকে এলাহাবাদে।

বাড়ির গেটে পুলিস পাহারা। পার্টির কর্মীরা থাকে একতলায়। দোতালায় তাঁর অফিস। তাঁর এক সেক্রেটারী সস্ত্রীক থাকে দোতালার একটি ঘরে। তিনতলা একেবারে ফাঁকা। অনেক গোপন বৈঠক হয় এখানে। রাত্রে ঘুমোবার সময় তাঁর ঘরের বাইরে একজন নেপালী দারোয়ান ঝিমোয়।

আচার্যমশাই দুপুরের খাওয়া যেদিন বাড়িতে খান, সেদিন একতলার খাবারঘরে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে একসঙ্গেই খান। রাত্তিরের খাবার তিনতলায় একা। তখন শুধু মন্দিরা থাকে তাঁর পাশে।

খাবার খুব সামান্য। দু' পিস পাঁউরুটি। এক টুকরো পেঁপে সেদ্ধ, দুটি টম্যাটো, ছোট একবাটি মুর্গীর মাংস, একটি সন্দেশ।

মন্দিরা খাবার সাজিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। আচার্যমশাই চিন্তিত মুখে খেয়ে যাচ্ছেন। দেশের অনেক সমস্যা নিয়ে যাঁকে চিন্তা করতে হয়, তিনি আপাততঃ দাবার চাল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

এক সময় মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, হিমাদ্রি চা কিংবা কফি কিছু খাবে নাকি?

মন্দিরা বললো, দেখছি।

মন্দিরা ধীর পায়ে হেঁটে এলো খেলার ঘরের দিকে। এতক্ষণ সে হিমাদ্রির সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। ঘরে এসে দেখলো, হিমাদ্রি একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে আছে।

মন্দিরা একেবারে হিমাদ্রির সামনে এসে ঝুপ করে বসে পড়ে বললো, তুমি চা কিংবা কফি—কিছু খাবে ?

হিমাদ্রিশেখর মাথা দু' দিকে দুলিয়ে জানালো, না।

মন্দিরা হিমাদ্রির মুখের একেবারে সামনে মুখ এনে বললো, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ?

হিমাদ্রি বললো, কিসে নিষ্ঠুর ?

—তুমি দু' একবার ইচ্ছে করে হারতে পারো না ?

—ইচ্ছে করে হারবো ? কিন্তু তাকে তো খেলা বলে না !

—আহা, কি এমন জীবনমরণের খেলা ? উনি যদি দু' একবার জিতলে আনন্দ পান।

—ওঁদের সব ব্যাপারেই জেতা অভ্যেস।

মন্দিরা হিমাদ্রির নাকের ডগায় ছোট্ট করে একটা চুমু দিয়ে বললো, তুমি বড্ড রাগী ?

হিমাদ্রি মন্দিরার সেই হাতটা তুলে নিল যেটা আচার্যমশাই একটু আগে ধরেছিলেন। হিমাদ্রি সেই হাতটা ধরে যেন বৈজ্ঞানিকের মতন পরীক্ষা করতে লাগলো।

মন্দিরা জিজ্ঞেস করলো, কি দেখছো ?

—কিছু না !

—ওঃ, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। তুমি এত চাপা, কোনো কথা মুখ ফুটে বলতে পারো না ? তুমি কি চাও যে আমি —

খাবার খেতে খেতে আচার্যমশাইয়ের মনের মধ্যে একটা অবৈধ চিন্তা উঁকি মারতে লাগলো। কিছুতেই চিন্তাটা মন থেকে তাড়াতে পারলেন না। এই ফাঁকে হিমাদ্রিশেখর গুটি কিছু অদলবদল করে ফেলবে না তো ? এই দানটা তিনি জিতবেনই। হিমাদ্রির অনেকগুলি বল নষ্ট হয়ে গেছে। এবার তিনি শোধ নেবেন। এক বছরের মধ্যে তিনি ঐ ছেলেটাকে একবারও হারাতে পারেন নি—এতে বুকের মধ্যে একটা জ্বালা ধরায়। ওকে একবার অন্তত: হারাতে পারলে তিনি দাবা খেলার নেশাটা কিছুদিনের জন্য অন্তত:

পরিত্যাগ করতেন। সামনে অনেক কাজ। সাধারণ নির্বাচন আসছে; আগামী মাসে প্রধানমন্ত্রীর সফর। দু' তিনটে জেলায় দলবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে শায়েস্তা করা।

দলের অনেক কর্মীই আচার্যমশাইয়ের এই দাবা খেলার নেশাটা একদম পছন্দ করে না। দেশ চালাবার দায়িত্ব যাদের হাতে, তাদের কি এরকম অলসভাবে সময় কাটালে চলে? তা ছাড়া জরুরি ঘটনা কি দিনক্ষণ হিসেব করে আসে? রবিবার সন্ধের পর আচার্য মশাইয়ের সঙ্গে কোনো জরুরি কথা বলার উপায় নেই।

হিমাদ্রিশেখরকেও পছন্দ করে না দলের কর্মীরা। ছেলেটার নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। বিরুদ্ধ দলের স্পাই নয় তো! আচার্যমশাই এসব কথা শুনে হাসেন। সে রকম কোনো প্রমাণ তিনি পান নি! এখন হিমাদ্রিশেখরের আশা যদি তিনি বন্ধ করে দেন, তাহলে ছেলেটা সারাজীবন জিতে থাকবে। সে কথা মনে মনে ভাবলেও কষ্ট হয়। তিনি জীবনে কারুর কাছে হারেননি কোনো ব্যাপারে—আর এই সামান্য দাবা খেলায়!

ছেলেটা গুটি বদলাবে না তো?

খাওয়া অসমাপ্ত রেখে আচার্যমশাই অন্যমনস্ক ভাবে চলে এলেন এ ঘরে! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি একটা দৃশ্য দেখলেন। কোনো অসমীচীন দৃশ্য নয়। মন্দিরা আর হিমাদ্রিশেখর মুখোমুখি বসে আছে। কেউ কারুর শরীর স্পর্শ করে নি। কিন্তু কি অদ্ভুত দু' জনের দৃষ্টি। যেন মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে চেয়ে থাকা। ওরা তাঁকে লক্ষ্য করলো না।

আচার্যমশাই একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সেখান থেকে সরে এলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন। হিমাদ্রিশেখর এসেছে মন্দিরাকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে। তাঁর আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। মন্দিরা তাঁর সামনে হিমাদ্রিশেখরের সঙ্গে একটাও কথা বলে না। সাধারণ আলাপ পরিচয় থাকলে দু' একটা সাধারণ কথাবার্তা বলতোই। অসাধারণ সম্পর্ক বলেই ওরা এরকম নিঃশব্দ?

বুকটা টনটন করে উঠলো আচার্যমশাইয়ের। তিনি নিজেই দেখে শুনে মন্দিরার বিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন। এক সময় চেয়েছিলেন ওকে রাজনীতিতে আনতে। মন্দিরা বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি, তিনি নিজেও মত বদলেছেন! তিনি ইচ্ছে করলে মন্দিরাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে আনায়াসেই একটা উপমন্ত্রী বানিয়ে দিতে পারতেন। বয়েস কম তো কি হয়েছে, আজকাল তো তরুণদেরই জয়জয়কার। কিন্তু মত বদলেছেন এই জন্য যে আজ কাল রাজনীতিএমন একটা গোলমেলে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে শুধু বয়সের তফাতের জন্যই মন্দিরা রাজনীতিতে তাঁর পাশাপাশি আর থাকতে পারবে না। যুবনেতারা ওকে কেড়ে নেবে। ওর কাজে অন্যরকম মন্ত্র দেবে। থাক, ওসব দরকার নেই। তার বদলে, তিনি ঠিক করেছিলেন, খুব ভালো একটা ছেলে দেখে মন্দিরার সঙ্গে বিয়ে দেবেন, ছেলেটিকে জীবনে দাঁড় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। যাতে মন্দিরা তাঁর কাছাকাছি থাকতে পারে।

তার বদলে মন্দিরাকে নিয়ে যাবে এই অহংকারী ছেলেটা? সাধারণ একটা ব্যাঙ্কের কেরানী? যে তাঁর কাছ থেকে কোনো দয়া নেবে না? কোনো রকমে আটকানো যায় না? নিশ্চয় যায়! হিমাদ্রিশেখরকে মফস্বলে কোথাও বদলী করে দেওয়া যায় অনায়াসেই—তার নামে কোনো বদনাম এনে চাকরিটাও—। কিন্তু মন্দিরা যদি জানতে পারে? মন্দিরার ভাঙা মন যদি জোড়া না লাগে? তা হলেও তিনি হেরে যাবেন ছেলেটার কাছে। ছেলেটা যদি দয়া চায়, যদি ভালো একটা চাকরি চায়, তাহলে না হয় ভেবে দেখা যেত।

মন্দিরা ফিরে এসে দেখলো, আচার্যমশাই খাওয়া না শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন চুপ করে।

মন্দিরা বললো, একি? আর খেলেন না যে?

—আর খাবো না রে!

—না, মাংসটা সব খেতেই হবে।

—ওরে তোর মতন এত যত্ন করে আমাকে সারাজীবন কে খাওয়াবে ?

—আহা. আমি কি যত্ন করেছি ?

হাত ধুয়ে আচার্যমশাই আবার খেলতে এলেন। সুমিষ্ট স্বরে হিমাদ্রিশেখরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বেশী রাত্তির হয়ে যাচ্ছে না তো ?

—না।

—আমার নেশার জন্য তোমাকে এতক্ষণ আটকে রাখি।

—আমি রাত করেই বাড়ি ফিরি।

মন্দিরাও এসে বসেছে পাশে। আচার্যমশাই বললেন, কি রে, তুই বাড়ি যাবি না ?

—আপনাদের খেলা আগে শেষ হোক।

—খেলা কতক্ষণে শেষ হবে ঠিক নেই।

—মোটেই তা চলবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে আপনাকে শুয়ে পড়তে হবে। বেশী রাত জাগা আপনার সহ্য হয় নাকি ?

—জেলে থাকতে অনেক সময় সারা রাত জেগেছি।

—সে আলাদা কথা। তখন আপনার বয়েস কত ছিল ?

—গত বছরও চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়ে—

—হিমাদ্রিশেখর খেলাটা আরও কঠিন করে তুলছে। আচার্যমশাই ভেবেছিলেন, এই বাজিটা তিনি জিতবেনই। এখন বুঝতে পারছেন, খেলাটা ক্রমশঃই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাঁর। এমন ভাবে সাজিয়েছে যে তিনি চাল খুঁজেই পাচ্ছেন না।

হঠাৎ মুখ তুলে তিনি বললেন, আচ্ছা, হিমাদ্রি, তোমার সঙ্গে মন্দিরার আলাপ নেই ? ও খুব ভালো মেয়ে।

হিমাদ্রি কিছু বলার আগেই মন্দিরা বললো, বাঃ, আলাপ থাকবে না কেন ?

—তা হলে তোমরা কোনো কথা বলো না কেন ?

—খেলার সময় কথা বলা তো আপনিই পছন্দ করেন না।

আচার্যমশাই মন্দিরার কাঁধে হাত রেখে বললেন, অন্য কেউ এ সময়ে ঘরে এসে কথা বললে আমার মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তোর কথা আলাদা।

আচার্যমশাই মুচকি মুচকি হাসছেন। মন্দিরা তাঁকে ঠকাতে চাইছে। যেন হিমাদ্রিশেখরকে সে খুব সামান্যই চেনে। আজকালকার ছেলে মেয়েরা ভাবে, বুড়োরা কিছু বোঝে না? বুড়োদেরও যে এক সময় কম বয়েস ছিল, তা মনে থাকে না ওদের।

হিমাদ্রি একটু আগে সাংঘাতিক একটা কঠিন চাল দিয়েছে। সেটার উত্তর দেবার বদলে আচার্যমশাই যেন আলস্য ভাঙার জন্যই মন্দিরাকে টেনে আনলেন কোলের কাছে।

মন্দিরা কোনো আপত্তি করলো না। আচার্যমশাই মন্দিরার নগ্ন বাহুতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তুই ছাড়া আমার কথা কেউ ভাবে না। তুই দূরে চলে গেলে আমি কি যে করবো।

দাবার ছক থেকে চোখ তুলে হিমাদ্রি সেই সময় তীক্ষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে।

এই সুযোগে আচার্যমশাই টুক করে হিমাদ্রির একটা বোড়ে তুলে নিলেন বোর্ড থেকে। সেটা ফেলে দিলেন বাইরে। এই সামান্য একটা বোড়ে এক সঙ্গে তাঁর মন্ত্রী ও গজকে আটকে ফেলেছিল।

এবার তিনি মন্ত্রীর চাল দিয়ে বললেন, সামলাও হিমাদ্রি!

হিমাদ্রি চমকে চোখ নামালো। প্রথমে ভাবলো, সে বুঝি সত্যিই হেরে গেছে এবার।

আচার্যমশাই ভাবলেন, হিমাদ্রিকে একবার অন্ততঃ হারাতে পারলেই সব কিছু বদলে যাবে। তার অহংকার ভাঙলেই সে দয়া চাইতে বাধ্য হবে। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে সে রাজী হবে আরও বড় চাকরি নিতে। মন্দিরাকে পেতে হলেও অনুমতি নিতে হবে তাঁর।

হিমাদ্রি চেঁচিয়ে বললো, আমার বোড়েটা কোথায় গেল?

—কোন্ বোড়ে?

—এই যে এখানে ছিল!

—ছিল না তো!

—নিশ্চয়ই ছিল!

—তুমি ভুল করছো হিমাদ্রি, আমার মন্ত্রী তো সেটাকে অনেকক্ষণ আগেই খেয়ে ফেলেছে!

—হতেই পারে না!

—তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছো মনে হচ্ছে। আজ বুঝি খেলায় আর মন নেই!

—আমি ঠিকই খেলছি। আমার এরকম ভুল হতেই পারে না।

—তা হলে তুমি দেখতে পেলে না, আমার মন্ত্রী তোমার ঐ বোড়েটাকে।

—আপনাদের মন্ত্রীরা বুঝি এই রকম ভাবেই সাধারণ মানুষকে খায়?

আচার্যমশাই উদারভাবে হাসতে লাগলেন। তাঁর মুখ চোখ এখন আনন্দে উদ্ভাসিত। তিনি বললেন, এখনো চেষ্টা করে দেখো যদি পারো!

মন্দিরাকে প্রায় বুকের কাছে টেনে এনে আদর করতে লাগলেন তিনি। দাদামশাইরা তো এরকমভাবে নাতনীকে আদর করতেই পারে। এখন তিনি খুবই প্রসন্ন।

হিমাদ্রি জ্বলন্ত চোখে মন্দিরার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি এই জন্যই বলছিলে, এঁকে ইচ্ছে করে জিতিয়ে দিতে?

মন্দিরা কোনো উত্তর দিল না।

হিমাদ্রি আবার বললো, এঁদের সব জায়গায় জেতার অভ্যেস বলেই—

আচার্যমশাই বললেন, তুমি হেরে গেছো বলেই মাথা গরম করছো!

হিমাদ্রি এক ধাক্কায় বোর্ডটা উলটে দিল। আর একটাও কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে!

আচার্যমশাই হাসতে লাগলেন আপন মনে। মন্দিরার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই সব ছেলেরা জীবনটাকে ঠিক মতন চেনে না। অনেক জায়গায় যে হার স্বীকার করে নিতেও হয়।

মন্দিরা বললো, ও কি সত্যিই হেরেছে?

আচার্যমশাই বললেন, নিশ্চয়ই।

আরো জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

আরও আধ ঘণ্টা বাদে মন্দিরা বেরিয়ে এলো সে বাড়ি থেকে। একটা মোড় পেরুলেই তার বাড়ি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে আসছিল। মোড়ের কাছে লাইট পোস্টের নীচে সে দেখতে পেল হিমাদ্রিশেখরকে।

হিমাদ্রি এগিয়ে এসে মন্দিরার হাত চেপে ধরে বললো, এত দিন যে কথা তোমাকে বলতে পারি নি, আজ সেই কথাটা বলার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।

মন্দিরা বললো, তুমি কি বলবে আমি জানি।

—জানো? উত্তরটা?

—সেটাও তুমি জানো।

—শুধু তাই নয়। আমি বলতে চাই, আজ থেকে তুমি কক্ষণো আর এ বাড়িতে আসবে না। ওখানে অন্যায় খেলা হয়।

—সেই জন্যই তুমি কক্ষণো হারতে চাও নি?

—হ্যাঁ, আমি দেখতে চেয়েছিলাম, উনি অন্যায় করে জিততে চান কিনা। নিজের চোখে ওঁর অন্যায় না দেখলে আমার বলার মতন জোর থাকতো না।

মন্দিরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো, আমিও আজই প্রথম ...লাম। তুমি বিশ্বাস করো, উনি এর আগে আর কখনো আমাকে এরকমভাবে বুকের কাছে টেনে বসাবার চেষ্টা করেন নি। উনি এইভাবে তোমাকে হারাতে চেয়েছিলেন।

—জানি

—তবু, তুমি হারলে না কেন ?

—হারলে আমি তোমাকে কখনো জোর করে চাইতে পারতাম না।

মন্দিরা খুব শান্তভাবে বললো আজো, তুমি হারো নি, তুমিই আসলে জিতেছো।

সমাপ্ত